দুই শতাব্দীর বিপ্লব

চিন্মোহন সেহানবীশ

কথামালা
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৬২

প্রকাশক :
মণীন্দ্র রায়
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রক :
দেব প্রিণ্টার্স
৭-এ, প্রতাপ চ্যাটার্জী লেন
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ :
তরুণ চক্রবর্তী

মুখবন্ধ

সত্যই, দুই শতকে সারা পৃথিবীর যে রূপান্তর ঘটেছে তার হিসেব নিতে বসলে দিশেহারা হতে হয়। কোনো কূলকিনারা যেন মেলে না ওলটপালটের। অথচ মানুষের গোটা ইতিহাসের মধ্যে দুশো বছর আর কতটুকু!

খাওয়াদাওয়া, পোশাকআশাক, বাড়িঘর, চলাফেরার বাহন, অস্ত্রশস্ত্র, আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থা—জীবনযাত্রার সাজসরঞ্জামের দিকে তাকালে চোখ যেন ঝলসে যায় রদবদলের বহর দেখে। আর এর পেছনে মানুষের হাতিয়ারের যে চমকপ্রদ শ্রীবৃদ্ধি তা কি আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের থেকে কিছু মাত্র কম তাজ্জব? বাস্তবিক বাষ্প-বিদ্যুতের মতো প্রাকৃতিক শক্তির নাকে দড়ি দিয়ে অসাধ্য সাধন করছে মানুষ। প্রকৃতির ভাঁড়ার থেকে সে লুটে আনছে অফুরন্ত ঐশ্বর্য।

কিন্তু সত্যই কি সে ঐশ্বর্যবান হতে পেরেছে? স্বস্তি পেয়েছে জীবনে? সব দেশে, সমাজের সব মানুষের মধ্যেই কি জীবনযাত্রার সাজসরঞ্জামের সমান ছড়াছড়ি? ফোর্ডসাহেব, নিজাম বা আগা খাঁর শ্রীমুখের পাশাপাশি তেতাল্লিশ সনের মন্বন্তরে যে তিরিশ লাখ বাঙালী না খেয়ে পথে পথে শুকিয়ে মরে গেলো তাদের মরা মুখের কথা একবার মনে করুন; মনে করে দেখুন হিরোসিমা, নাগাসাকির বীভৎস, মার্কিন বোমা-ঝলসানো দেহগুলোর কথা। তাহলেই এ প্রশ্নের জবাব মিলবে। জবাব মিলবে আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালির অগুনতি বেকার বা আধা-বেকার মানুষের অন্তহীন সারির জীবন্ত সাক্ষ্য থেকে। আবার অস্ট্রেলিয়ার মাওরি, মার্কিন মুলুকের রেড ইণ্ডিয়ান, আফ্রিকার হটেনটটদের দিকে তাকালেও পাওয়া যাবে এর উত্তর।

না, রূপান্তর সকলের পক্ষে, সব দেশের পক্ষে, নিশ্চয়ই সমান কল্যাণকর হয়নি। তবু সর্বত্রই পৌঁছিয়েছে রূপান্তরের মশাল। কোথাও বা তার সর্বনেশে আঁচে জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়েছে সমাজের অগুনতি মানুষ আর সামান্য জনকয়েক ভাগ্যবান তাতে আগুন পুইয়েছে আরামে। কোথাও বা তার স্নিগ্ধ আলো পথ দেখাচ্ছে দেশের প্রত্যেকটি মানুষকেই।

যে যাই হোক, এতে ভুল নেই যে গত দুশো বছরে প্রচণ্ড ওলটপালটের ঘূর্ণিপাকে পড়েছে সারা পৃথিবী। ভালো হোক, চাই মন্দ হোক—কারোই রেহাই মেলেনি এর সর্বগ্রাসী খপ্পর থেকে।

কিন্তু রূপান্তর কি শুধু জীবনযাত্রার সাজসরঞ্জামে বা যে হাতিয়ারের জোরে মানুষ প্রকৃতির হাত থেকে সেই সব সরঞ্জাম আদায় করে থাকে তার বেলাতেই? সবার আগে ওটাই অবশ্য আমাদের চোখে পড়ে। পড়ারই কথা। তবে একটু নজর করলে বোঝা যায় যে হাতিয়ারের রূপান্তরই সব নয়। তার আশ্চর্য সৃষ্টিশক্তির তোড়ের সামাল দিতে গিয়ে আবার রূপান্তর ঘটেছে সমাজের ছাঁদেও, অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও।

এ রূপান্তরও নিশ্চয়ই সর্বব্যাপী নয়। তবু সাধারণভাবে বলা চলে যে এদিক থেকে দুশো বছর আগের পৃথিবীর দুদফা রূপান্তর ঘটেছে বা ঘটছে এ সময়ের মধ্যে। সে রূপান্তর সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে আর এখন ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে।

এই সমাজের রূপান্তর ব্যাপারটা খুবই জরুরী। কারণ সমাজে প্রাচুর্যের পাশেই অনটনের, প্রভু-দেশের পাশাপাশি গোলাম-দেশের রহস্যের জড় রয়েছে এইখানে। আবার এরই মধ্যে সন্ধান মিলবে কোনো কোনো দেশের সমস্ত মানুষের শ্রীবৃদ্ধির কারণেরও। ব্যাপারটা তাই তলিয়ে বোঝা দরকার। নইলে ওপর ওপর দেখলে মার্কিন ও রুশদের মধ্যেকার আসমান-জমিন ফারাকটা চোখে নাও পড়তে পারে। চাই কি মার্কিনী সমাজের চোখধাঁধানো চটকে মতিভ্রম ঘটাও বিচিত্র নয়।

এ রূপান্তরেরই দিশা পাবার চেষ্টা হয়েছে "দুই শতাব্দী দুই পৃথিবী"তে। তার জন্যে খুব আলগা করে সূত্র ধরা হয়েছে ইতিহাসের —প্রধানত সেটা অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক। এর কারণ, খাটো বহরের মধ্যে সব কথা বলা যাবে না—সামাজিক রূপান্তরের একেবারে বনেদের কথা, কি বড় জোর ঠিক তার লাগালাগি ওপরতলার কথা কোনোমতে এর মধ্যে আঁটানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। তাই খুব জরুরী হলেও লোভ সামলে ছাঁটাই করতে হয়েছে মানুষের চিন্তা-ভাবনার, তার সাংস্কৃতিক জীবনের বিচিত্র কাহিনী। এমন কি অর্থনীতি বা রাজনীতির দিক থেকেও নিশ্চয়ই এ বই পূর্ণাঙ্গ নয়। কারণ খুবই স্পষ্ট, দেড়শ পাতার মধ্যে গোটা পৃথিবীর দুই শতাব্দীর ধারাবাহিক অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ইতিহাস লেখার কথা পাগলেও মনে স্থান দিতে পারে না। ঐ সময়ে নানান দেশে সব থেকে জরুরী যে সব ঘটনা ঘটেছে সেগুলি ছাড়াছাড়া বা আচমকা ব্যাপার নয়—এই ধারণাবশে শুধু চেষ্টা হয়েছে তাদের মধ্যেকার যোগসূত্রটি পাঠকদের কাছে ধরিয়ে দেওয়ার। এই জন্যেও ফের আবার ছাঁটতে হয়েছে ইতিহাসের বহু ডালপালা। ফল কী দাঁড়িয়েছে, তা বলবেন ঐ পাঠকেরাই।

কথা উঠতে পারে, হাজার হাজার বছরের মানুষের ইতিবৃত্ত থেকে শেষ দুই শতাব্দী অমনভাবে বেছে নেওয়া হলো কেন? এই জন্যে যে, আলোচ্য দুই শতকই হলো আধুনিক মানুষের অব্যবহিত ঐতিহাসিক পরিবেশ। কারণ ফরাসী বিপ্লবে যে-শ্রেণীর প্রভুত্বের সূচনা (এর পালা আগে শুরু হলেও ফরাসী বিপ্লবেই তার সত্যকার প্রতিষ্ঠা। এ বিপ্লবের প্রভাবও ছড়িয়ে পড়ে প্রায় সারা পৃথিবীতেই) তারই ক্রমবিকাশ, জরা ও মৃত্যুই আমরা প্রত্যক্ষ করেছি এ দুই শতকের ইতিহাসে। আর তারই পাশাপাশি দেখছি নতুন আর-এক শ্রেণীর আবির্ভাব, সংহতি ও দুনিয়াজোড়া জয়যাত্রা।

অর্থাৎ, এ দুই শতকই হলো সত্যকার আধুনিক যুগ। কিন্তু যুগান্তরের ঘটাও আজ চোখে পড়ছে বেশ ফলাওভাবেই। স্পষ্ট

বোঝা যাচ্ছে, যবনিকা পতনের আর দেরি নেই বেশি। তারপর সারা পৃথিবী জুড়ে শুরু হবে নতুন আর-এক যুগ।

কিন্তু এককালে যারা সমাজের প্রভু ছিল তাদের হটিয়ে নতুন আর-এক শ্রেণীর ক্ষমতা দখল—এটা কি খুব একটা অভিনব ব্যাপার? এমন কাণ্ড এর আগে আর কখনো কি দেখা যায়নি?

নিশ্চয়ই গেছে। একাধিকবারই গেছে। তবু কিন্তু তফাত রয়েছে অনেকখানি। একটু খুঁটিয়েই দেখা যাক ব্যাপারটা।

প্রাচীন থেকে আধুনিকের সূচনা

আদিম যুগের কথাই ধরি। প্রকৃতির সঙ্গে যুঝবার, তাকে বশ মানাবার কায়দা না জানা থাকায় মানুষ এ সময়ে প্রাকৃতিক শক্তির বিপুলতা ও বৈচিত্র্যের সামনে খুবই অসহায় ছিল। ছুঁচলো পাথরের হাতিয়ারই ছিল তার একমাত্র সম্বল। তাই দিয়ে বড় জোর কোনোগতিকে টিকে থাকার মতো খাওয়া-পরার সংস্থান হতে পারত। তাও হতো সমাজের সব মানুষ মিলেমিশে শিকার বা ফলমুল জোগাড়ের কাজে হাত লাগালে তবেই। এ হেন অভাব, অনটন, অনিশ্চয়তার মধ্যে কোনো লোকের পক্ষেই গতর না খাটিয়ে, অন্যের মেহনতে বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না। কারণ কেউই সকলের সঙ্গে হাড়-ভাঙা খাটুনি খেটেও কোনোমতে টিকে থাকার চাইতে বেশি কিছু জোগাড় করতে পারত না। অর্থাৎ, সমাজে বাড়তি বলতে এ সময়ে কিছু ছিল না। আর বাড়তি ছিল না বলেই শোষণও ছিল না। কারণ একজন মানুষ মেহনত করে নিজেকে কোনোমতে টিকিয়ে রাখার চাইতে বাড়তি কিছু জোগাড় করতে পারলে তবেই সেই বাড়তির উপরে অন্য লোকের ভাগ বসানোর বা শোষণের প্রশ্ন উঠতে পারে। আদিম সমাজে শোষণ ছিল না—তাই সবাই সমান ছিল। এই অভাব-অনটনের সমতার সমাজেরই নাম আদিম সাম্যবাদী সমাজ।

তারপর বহু বছর ধরে আস্তে আস্তে মানুষ শিখল জন্তু-জানোয়ার

পোষ মানাবার, ফসল ফলানোর কায়দা। এতে তার খাওয়াপরার ব্যবস্থা আগের চাইতে অনেক সহজ হলো। সম্ভব হলো একজন মানুষের পক্ষে নিজের প্রয়োজনের থেকে বেশি জিনিসপত্র বানানো। আর সমাজে যেই এই বাড়তি সামগ্রীর উদ্ভব হলো তখনই দেখা দিল শোষণের সম্ভাবনা। কারণ নিজে গতর না খাটিয়ে অন্যের তৈরি বাড়তিকে শুষে নেওয়ার নামই তো শোষণ।

তাই মানুষের হাতিয়ার চালাবার দক্ষতা বেশ কিছুটা উন্নত হয়ে ওঠার পরে আদিম সাম্যবাদী সমাজে শোষণের সূচনা দেখা গেল। তার ফলে ঐ সাম্যের সমাজ ধ্বংস হলো আর তার জায়গায় এলো শোষক ও শোষিত শ্রেণীতে বিভক্ত নতুন সমাজ। এই নতুনের আবির্ভাব একদিকে যেমন সমাজে শোষণ ও জুলুমের আমদানি করল তেমনই আবার এও প্রমাণ করল যে ইতিমধ্যে হাতিয়ারের যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে।

এ পর্যন্ত পশ্চিমের অনেক দেশে পরের পর তিন ধরনের শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ দেখা গেছে: দাস-সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও ধনতান্ত্রিক সমাজ। অন্যান্য দেশে এই ক্রমের কিছুটা রকমফের দেখা গেলেও মূলত এর কোনো ব্যতিক্রম হয়নি।

আদিম সাম্যবাদী সমাজকে হটিয়েই উদ্ভব হয় দাস-সমাজের। এ সমাজে দুটিমাত্র শ্রেণী—প্রভু ও দাস বা ক্রীতদাস। ক্রীতদাসেরা এ ব্যবস্থায় গোরুভেড়া বা হাললাঙলের মতোই প্রভুদের সম্পত্তি। প্রভুরা ঐ সব জিনিসের মতো তাকেও বেচাকেনা করতে পারে। মারধোর তো বটেই, এমনকি তাকে হত্যা করার অধিকারও এ সমাজে প্রভুদের রয়েছে। তবে ক্রীতদাসেরা যাতে প্রভুদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উদ্দেশ্যে গতর খাটিয়ে যেতে পারে তার জন্যে প্রভুকে গোরুভেড়ার মতো তাদেরও খাওয়াপরা, বসবাসের কিছুটা ব্যবস্থা করতে হয়। নইলে ক্রীতদাসেরা যদি মরেই যায় তবে প্রভুরা শোষণ করবে কাকে? খাওয়াপরার ব্যবস্থা ছাড়াও দাসপ্রথায় প্রভুকে ক্রীতদাসদের জন্যে জমি, যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল জোগাতে হয়। ক্রীতদাসেরা আসলে

ঐ সবেরই সামিল। ও সব যার সম্পত্তি সে নিজেও আবার তারই সম্পত্তি। তাই ক্রীতদাসের মেহনতে যা তৈরি হয় তার মালিকও হলো ঐ প্রভুরাই।

দাসপ্রথায় শোষণ ব্যাপারটার মধ্যে কোনো রাখঢাক নেই। মানুষ এখানে সরাসরি অন্য মানুষের সম্পত্তি। ক্রীতদাসেরা হলো প্রভুদের 'সবাক যন্ত্রমাত্র'।

উৎপাদনের হাতিয়ার ও মানুষের দক্ষতার উন্নতির ফলে একদিন এই দাস-সমাজের ভিত্তিও টলে যায়। তার জায়গায় জুড়ে বসে যে-ব্যবস্থা তার নাম সামন্ততন্ত্র। এশিয়ায় সামন্ততন্ত্রের চেহারা ঠিক ইউরোপের মতো হয়নি। তবু নানা রকমফের সত্ত্বেও সামন্ততান্ত্রিক শোষণের মোদ্দা কথাটা হলো এই :

দাস-সমাজে যেমন প্রভু ও ক্রীতদাস, সামন্ততান্ত্রিক সমাজে তেমনই জমিদার ও ভূমিদাস। কিন্তু ক্রীতদাসদের মতো ভূমিদাস জমিদারের সম্পত্তি নয়। অর্থাৎ, জমিদার ভূমিদাসকে বেচাকেনা করতে পারে না, তাকে মেরে ফেলতেও পারে না। তা ছাড়া এ ব্যবস্থায় ভূমিদাসের কিছুটা করে জমি থাকে যার ফসলের মালিক সে নিজেই। এ সব দিক দিয়েই ভূমিদাসদের অবস্থা নিশ্চয়ই ক্রীতদাসদের চাইতে কিছুটা ভালো।

আর এক দিক থেকে কিন্তু ভূমিদাস প্রায় ক্রীতদাসেরই সামিল। জমিদার ভূমিদাসকে বেচাকেনা করতে পারে না বটে, কিন্তু ভূমিদাস-শুদ্ধ সমস্ত জমিটাই সে বেচতে বা কিনতে পারে। অর্থাৎ, এক জমিদার অন্য জমিদারকে জমি বেচলে জমির সঙ্গে সঙ্গে ভূমিদাসও চলে যায় নতুন জমিদারের তাঁবে। ভূমিদাস কিন্তু খেয়ালখুশিমতো অন্য জমিদারের জমিতে চলে যেতে পারে না। কারণ জমিদারের হুকুম ছাড়া জমি ছেড়ে তার এক পাও নড়ার নিয়ম নেই। জমির সঙ্গে সে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা।

তা ছাড়া আর একটা কথা। ভূমিদাস তার নিজের বরাদ্দ জমিতে যে ফসল ফলায় তার মালিক যেমন সে নিজেই, তেমনই

আবার সে তার জমিদারের খাস জমিতেও হপ্তায় নির্দিষ্ট কয়েকদিন বেগার খেটে দিতে বাধ্য। সেখানে তার মেহনতে যে ফসল ফলে তার ওপরে তার কোনোই দাবি নেই। সে ফসলের মালিক হলো জমিদার।

এর থেকে বোঝা যায় যে এ ব্যবস্থাতেও শোষণ চলে প্রায় খোলাখুলি। তবে ভূমিদাসের চলাফেরা অবাধ না হলেও ক্রীতদাসের তুলনায় সে অনেকটা স্বাধীন। তার অবস্থা এ দিক থেকে অনেকটা ক্রীতদাস ও মজুরের মাঝামাঝি।

মানুষের হাতিয়ার ও দক্ষতার আরো উন্নতির ফলে সামন্ততন্ত্রেরও একদিন অবসান ঘটে। তার স্থান অধিকার করে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এই রূপান্তরের কাহিনী নিয়েই "দুই শতাব্দী দুই পৃথিবী"র সূচনা।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কিন্তু শোষণ আর খোলাখুলি নয়, প্রচ্ছন্ন। কারণ ক্রীতদাসের মতো মজুর পুঁজিপতির সম্পত্তি নয়। তাকে কেনাবেচা করা বা মেরে ফেলা চলে না ভূমিদাসের মতো সে জমির সঙ্গে বাঁধাও নয়। যখন খুশি সে যেখানে ইচ্ছে যেতে পারে, খুশিমতো পুঁজিপতি মালিক বদলও করতে পারে। এ সব দিকে তার অবস্থা ক্রীতদাস বা ভূমিদাসের চাইতে বেশ কিছুটা ভালো।

শোষণ তবে কোথায়? সেটা এইখানে যে ভূমিদাসের মতো মজুরও খানিকটা মাত্র সময় তার নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে লাগায়। বাকি সময়টা সে বেগার খাটে তার মালিকের জন্যে। আর ক্রীত-দাসের মতোই সে যে-সব জিনিসপত্র বানায় তার মালিক সে নিজে নয়, তার মালিক হচ্ছে পুঁজিপতি।

এখানে কিন্তু ভূমিদাস বা ক্রীতদাসের সঙ্গে মজুরের গরমিলটাও নজর করা দরকার। ভূমিদাস হপ্তায় ধরা যাক চারদিন তার নিজের জমিতে চাষ করে আর বাকি তিন দিন বেগার খাটে জমিদারের জমিতে। এখানে নিজের জন্যে মেহনত আর জমিদারের জন্যে বেগার খাটনি স্বতন্ত্র সময়ে, স্বতন্ত্র জায়গায় ঘটছে। কিন্তু মজুর যখন মালিকের সঙ্গে নির্দিষ্ট মজুরির জন্যে, ধরা যাক আটঘণ্টা খাটুনির চুক্তি করে, তখন ঐ আট ঘণ্টার মধ্যে কয়েক ঘণ্টার মেহনতে সে যা মালপত্র

বানায় তার থেকে উশুল হয় তার মজুরি আর বাকি সময়টায় সে বাড়তি যা-কিছু তৈরি করে তার সবটাই চলে যায় মালিকের পকেটে। এখানে নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে মেহনত আর মালিকের জন্যে বেগার খাটুনি—একই সময়ে একই জায়গায় ঘটে। তাই ওপর ওপর দেখলে শোষণ বোঝা যায় না। মনে হয় বেগারটা বুঝি বেগার নয়, মজুর বুঝি তার মেহনতের পুরো দামটাই পেল মালিকের কাছ থেকে।

আর ক্রীতদাসের মতো মজুরও তার বানানো মালপত্র পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিলেও ক্রীতদাস বা ভূমিদাসদের মতো সে মালিকদের জন্যে খাটতে আইনত বাধ্য নয়। আর খাটুনির জন্যে সে যে-মজুরি পায় মনে হয় সেটা বুঝি তার মেহনতের পুরো দাম। কাজেই তার তৈরি মালের মালিক যখন হয় পুঁজিপতি তখন চট করে কোনো শোষণ ঘটছে বোঝা যায় না। মনে হয়, যে যার ন্যায্য পাওনা গণ্ডাই বুঝি বুঝে নিল।

তাই ধনতান্ত্রিক শোষণ দাসত্ব বা সামন্ততন্ত্রের শোষণের মতো মোটেই প্রকাশ্য নয়। তবু প্রচ্ছন্ন হলেও সে শোষণ শোষণই। স্বাধীন মজুর আসলে স্বাধীন নয়। সেও এক ধরনের দাসত্বই করে —মজুরির দাসত্ব।

কাজেই এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত সব ওলটপালট ঘটেছে হয় তা আদিম সাম্যবাদের শোষণহীন, শ্রেণীহীন সমাজ থেকে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে রূপান্তর, নয়তো বা এক ধরনের শোষণ থেকে আর এক ধরনের শোষণে রূপান্তর। কিন্তু আমাদের চোখের সামনে গত পঞ্চাশ-ষাট বছর জুড়ে আমরা যে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর দেখতে পাচ্ছি তা আর শোষণহীনতা থেকে শোষণে রূপান্তর নয়, শোষণের রকমফেরও নয়—তা হচ্ছে শোষণ থেকে শোষণহীনতায় রূপান্তর, অর্থাৎ শোষণ-ব্যবস্থারই সম্পূর্ণ অবসান।

তাই অতীতের সমস্ত বিপ্লবের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তফাত অনেকখানি। মানুষের গোটা ইতিহাস থেকে শেষের দুই শতাব্দী বাছাই করার এই হচ্ছে প্রধান যুক্তি।

আরো একটা কথা আছে। "দুই শতাব্দী দুই পৃথিবী"তে থেকে থেকে আমাদের দেশের কথাও উঠেছে। কিন্তু সীমাবদ্ধ পৃষ্ঠার মধ্যে গোটা পৃথিবীকে আঁটাতে হয়েছে বলে তার ধারাবাহিক আলোচনা সম্ভব হয়নি। অন্তত আমাদের দেশের বেলায় এমন ছাড়াছাড়া আলোচনায় কিছুতে আমাদের মন ভরতে পারে না। ভরা উচিতও নয়। তবে আমাদের দেশের আধুনিক যুগের ইতিহাস ভালো করে বুঝতে হয়তো এই আন্তর্জাতিক পৃষ্ঠপটটা কিছুটা কাজে লাগতে পারে। আমাদের দেশের অল্পশিক্ষিত মানুষ—মজুর, কৃষক ও মধ্যবিত্তদের যদি এ বই কোনো কাজে আসে তবে আমি কৃতার্থ হব।

"দুই শতাব্দী দুই পৃথিবী" লেখার ব্যাপারে বহু বন্ধুবান্ধবের সাহায্য ও উৎসাহ পেয়েছি। তাঁদের নাম আলাদা আলাদা করে উল্লেখ করতে চাই না। সকলকেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তবে রচনার ভুলত্রুটির দায়িত্ব নিশ্চয়ই আমার একলারই।

উৎসর্গ

কৌশিক-সুমিত-সঞ্জয়-মিহির-পিয়ালীদের উদ্দেশে

সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা

১৭৮৯ সালের ফ্রান্স। দেশের চরম দুরবস্থা। কৃষক, কারিগর, মজুর—কারোই দুর্দশার যেন সীমা নেই। ওদিকে রাজকোষ শূন্য। রাজস্বের প্রায় অর্ধেক যাচ্ছে জাতীয় ঋণের সুদের খাতেই। অথচ ট্যাক্সের বোঝা এত বেশি যে নতুন ট্যাক্স বসিয়ে টাকা জোগাড়েরও আর জো নেই।

এ-হেন অবস্থায় এই সবের জন্যে যারা দায়ী সেই ফরাসী রাজা ষোড়শ লুই ও তার অপদার্থ সরকার স্থির করল স্টেটস জেনারেল-এর অধিবেশন বসাতে হবে।

'স্টেটস জেনারেল' ব্যাপারটা কী? এ হচ্ছে ১১৬৫ জন প্রতিনিধির এক জাতীয় পরিষদ। কিন্তু কাদের প্রতিনিধি? প্রথমত, গির্জার পাদ্রীদের। দ্বিতীয়ত, সম্ভ্রান্তবংশের মাতব্বরদের। তৃতীয়ত, সমাজে এরা ছাড়া আর যারা ছিল তাদের। তারা হলো দোকানী, ব্যবসায়ী, বণিক, মহাজন, কারিগর, কৃষক, মজুর—সবাই। এদের নাম 'তৃতীয় এস্টেট'; যেমন পাদ্রী ও বড় ঘরের বড়-লোকদের বলা হতো প্রথম দুই 'এস্টেট'। ঠিক হলো তৃতীয় 'এস্টেট'-এর প্রতিনিধি-সংখ্যা প্রথম দুই 'এস্টেট-এর' প্রতিনিধির প্রায় সমান হবে। এই তিন 'এস্টেট' মিলিয়েই হলো 'স্টেটস জেনারেল'।

'স্টেটস জেনারেল'-এর অধিবেশন আহ্বানটা ফ্রান্সে তখন একটা তাজ্জব ব্যাপার। কারণ ফরাসী রাজারা পুরোপুরি স্বেচ্ছাচারী—কারোর পরামর্শের তারা বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা রাখত না। এমন কি ১৬১৪ সালের পরে 'স্টেটস জেনারেল'-এর অধিবেশনই আর ডাকা হয়নি।

গোড়ায় গোড়ায় তাই 'স্টেটস জেনারেল'-এর অধিবেশন কেমন ভাবে হবে—তিন 'স্টেট' আলাদা আলাদা বসবে, না একত্রে

বসবে—তাই নিয়ে গণ্ডগোল বাধল। রাজা ও প্রথম দুই 'এস্টেট' এদের আলাদা বসা ও ভোট দেওয়াই চাইছিলেন। কারণ সে ক্ষেত্রে তৃতীয় এস্টেটকে বরাবরই ভোটে হারানো সম্ভব হতো। কিন্তু তিন এস্টেট একত্র বসলে সুবিধা 'তৃতীয় এস্টেট-'এর। কারণ তার প্রতিনিধি-সংখ্যা প্রথম দুই এস্টেটের প্রায় সমান হওয়ায় কোনোমতে গরিব-গোছের কয়েকজন পাদ্রী ও কিছুটা প্রগতিশীল জনকয়েক সম্ভ্রান্ত বড়লোকের সমর্থন জোগাড় করতে পারলে 'তৃতীয় এস্টেট' বেশ পাকাভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারত। এই নিয়ে রাজা ও প্রথম দুই এস্টেটের সঙ্গে তৃতীয় এস্টেটের লড়াই শুরু হলো।

১৭৮৯ সালের মে মাসে ভের্সাইতে তৃতীয় এস্টেটের প্রতিনিধিরা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ করেন। তাঁরা কিন্তু রাজতহবিলের কড়ি জোগানোর ব্যাপারে কিছুমাত্র মাথা না ঘামিয়ে অবিলম্বে আলোচনা শুরু করেন কী করে দেশের এমন এক গঠনতন্ত্র বানানো যায় যাতে চিরতরে খতম করা যায় সম্ভ্রান্তবংশীয়দের বিশেষ অধিকার।

স্বেচ্ছাচারী ফরাসী সরকার এবং তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা স্বভাবতই এতে বাধা দিতে লাগল। কিন্তু তাদের বাধা তুচ্ছ করে তৃতীয় এস্টেট নিজেকেই ঘোষণা করল জাতীয় পরিষদ নামে। অর্থাৎ, এখন থেকে সমস্ত আইন তৈরির অধিকার তারই, তার মঞ্জুরি ছাড়া সমস্ত ট্যাক্স আদায় বে-আইনী।

অভদ্র সাধারণ মানুষের এই বেয়াড়াপনায় চটে গিয়ে রাজ-কর্মচারীরা ১৭৮৯ সালের ২০শে জুন পরিষদ-প্রাসাদে তৃতীয় এস্টেটের প্রতিনিধিদের বাধা দিল। তাতে কিন্তু ফল হলো উল্টো। পরিষদ-প্রাসাদ থেকে বিতাড়িত 'তৃতীয় এস্টেট' পাশের এক টেনিস-মাঠে জড়ো হয়ে শপথ গ্রহণ করল—দেশের গঠনতন্ত্র রচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা নড়ব না, কাউকে আমাদের নড়াতেও দেব না।

তৃতীয় এস্টেট-এর এই বিদ্রোহী আচরণে রাজা স্বয়ং তাদের তিরস্কার করে জোর হুকুম জারি করলেন—অবিলম্বে তিন এস্টেটকে আলাদা আলাদা ভাবে বসতে হবে। রাজার কথা শুনে পাদ্রী ও

বড়ঘরের বড়লোকেরা তো উঠে গেল। কিন্তু তৃতীয় এস্টেটের প্রতিনিধিরা নড়ল না—আলোচনা চালাতে লাগল। একজন রাজকর্মচারী আবার যখন তাদের রাজ-পরোয়ানা শোনাতে গেল তখন প্রতিনিধিদের বিখ্যাত নেতা মিরাবো বললেন, 'তোমার মনিবকে গিয়ে বলো যে আমরা এখানে জড়ো হয়েছি জনসাধারণের আদেশে, সঙ্গীনের খোঁচায় ছাড়া এখান থেকে আমাদের নড়ানো যাবে না।'

এর পরে ধমকধামক বা চোখরাঙানি চললো না। ২৭শে জুন রাজাই অবশেষে মাথা নোয়ালেন। গরিব পাত্রী ও কিছুটা প্রগতিশীল বড়লোকেরা ইতিমধ্যেই তৃতীয় এস্টেটের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। রাজা তাদেরই মেনে নিলেন গঠনতন্ত্র রচনার যোগ্য পরিষদ হিসেবে। শুরু হলো স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থার পতন।

এই তো গেল একদিক। প্যারিসের জনসাধারণ কিন্তু আরো স্পষ্ট পথ দেখাল দেশবাসীকে। ১৪ই জুলাই তারা 'সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা'র বাণী নিয়ে প্যারিসের কুখ্যত বাস্তিল দুর্গের ওপরে চড়াও হলো, আর শ' খানেকের বেশি শহীদের আত্মদানের মূল্যে অধিকার করল ঐ দুর্গ। এ কিন্তু একটা মামুলি ব্যাপার নয়। কারণ কোনো লোক কোনো কারণে রাজার বা বড় ঘরের চাঁইদের বিরাগভাজন হলে তাকে এখানে আটকে রাখা হতো যতদিন খুশি। তার জন্যে কোনো বিচারেরও দরকার পড়ত না। কাজেই সাধারণ মানুষের কাছে বাস্তিল ছিলো চূড়ান্ত স্বেচ্ছাচারের প্রতীক। শুধু তাই নয়, রাজা ঐ সময়ে ভাড়াটে বিদেশী সৈন্যের সাহায্যে তৃতীয় এস্টেটের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত করছিল। এমন অবস্থায় 'বাস্তিল' দুর্গ দখল না করলে বিপদ ছিল খুবই। কারণ ঐ দুর্গ এমন জায়গায় ছিল যে সেটা যার হাতে থাকত সেই মুঠোয় রাখতে পারত প্যারিসকে।

শোনা যায়, জনসাধারণ বাস্তিল দুর্গ দখল করেছে এই খবর যখন দূত মারফৎ রাজার কাছে পৌঁছাল রাজা তখন অবাক হয়ে বললেন,

"কিন্তু এ তো বিদ্রোহ" ! তার উত্তরে দূত জানালো, "না, মহারাজ এ বিদ্রোহ নয়, বিপ্লব।"

ফরাসী বিপ্লবের সত্যকার সূচনা এই ১৪ই জুলাই থেকেই। কারণ এ খবর পাওয়া মাত্র সমস্ত ফরাসী কৃষক মাথাঝাড়া দিয়ে উঠল। জমিদারদের বাগানবাড়ি আর পাদ্রীদের মঠের ওপরে হামলা শুরু হলো। পুড়িয়ে ছাই করা হলো সামন্ততান্ত্রিক দাসখতের দলিলপত্র। ঘাবড়ে গিয়ে অভিজাতবংশের বড়লোক আর গির্জার পাদ্রীরা দলে দলে দেশছাড়া হলো, নয়তো নিজে থেকে সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক অধিকার ও বিশেষ ধরনের সুবিধা ছেড়ে দিতে লাগল। এ সবের মধ্যে ছিল দাম না দিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে নেওয়ার বা বেগার খাটুনি মারফত জবরদস্তি আদায়ের, নানা বিধিনিষেধ ও নজরানা চাপাবার, খেয়াল খুশিমতো শিকার করা ও বিচারের অধিকার। এই বিশেষ অধিকার ও সুযোগ খতম করার সঙ্গে সঙ্গে গির্জার বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি বিক্রিও শুরু হলো।

এইভাবে একদিকে কিছুটা নিয়মতান্ত্রিকভাবে দেশের গঠনতন্ত্র রচনার চেষ্টার পাশাপাশি চলতে থাকল ফরাসী জনসাধারণের, বিশেষ করে ফরাসী কৃষকদের, আপন ভাগ্য আপন হাতে রচনার ভার গ্রহণ। এই চললো ১৭৯১ সালের মাঝামাঝি অবধি। ঐ বছর জাতীয় পরিষদ মানুষের অধিকার সম্পর্কে এক ঘোষণা দেয় আর যে গঠনতন্ত্র তৈরি করে তাতে দেশবাসীকে 'সক্রিয়' ও 'নিষ্ক্রিয়' এই দুই ভাগে ভাগ করে। 'সক্রিয়' তারাই যারা কিছুটা সম্পত্তির মালিক ও বেশ মোটা রকম ট্যাক্স দেয়। এরাই গঠনতন্ত্র অনুসারে ভোটের অধিকার পেল। আর অধিকাংশ গরিব মানুষকে ঐ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হলো 'নিষ্ক্রিয়' নাম দিয়ে। অর্থাৎ, জাতীয় পরিষদ পুরোপুরি নতুন বড়লোকদের স্বার্থেই গঠনতন্ত্র গঠন করল।

ইতিমধ্যে কিন্তু যে সব পুরনো আমলের বনেদী বংশোদ্ভবেরা প্রাণ নিয়ে ফ্রান্স ছেড়ে পালিয়েছিল তারা চুপ করে ছিল না। তারাও জোট বাঁধতে শুরু করল—এমন কি কবলেন্স শহরে

একটা অস্থায়ী সরকার পর্যন্ত গঠন করল! এদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে ছিল ইউরোপের রাজারা, কারণ ফরাসী বিপ্লবকে প্রথম দিন থেকেই তাঁরা শত্রুজ্ঞান করেছিল। ১৭৯১ সালের মাঝামাঝি নাগাদ চক্রান্ত বেশ দানা বেঁধে ওঠে। সেকেলে সেনাপতিরা বিপ্লবদমনের জন্যে সৈন্যসামন্ত সমাবেশও করতে থাকে প্রায় প্রকাশ্যে।

এমনই সময়ে ষোড়শ লুই তার রানীকে নিয়ে একদিন প্রাসাদ থেকে গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়লেন। উদ্দেশ্য বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান। কিন্তু অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজা-রানীর পালানোর কথা রাষ্ট্র হয়ে পড়ে। ফলে তাঁরা মাঝপথে ধরা পড়েন। ফের তাঁদের ফিরিয়ে আনা হয় প্যারিসে।

রাজার পালানোর খবরে খেপে উঠল প্যারিসবাসীরা। তারা দাবি করল অবিলম্বে রাজাকে হটিয়ে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হোক। নতুন বড়লোকদের জাতীয় পরিষদ কিন্তু এ সব বাড়াবাড়ি পছন্দ করছিল না। তাই ১৭৯১ সালের ১৭ই জুলাই প্যারিসবাসীরা যখন রাজার পদত্যাগের দাবি দিয়ে মার্সের মাঠে মিছিল করছিল তখন তাদের ওপরে গুলি চালানো হলো। শুরু হলো পুলিসী জুলুম। মারাত বা ডানটনের মতো বিপ্লবী নেতাদেরও এর ফলে গা ঢাকা দিতে হয়। অর্থাৎ, বিপ্লবী জোটের মধ্যেই এবার বিরোধের লক্ষণ দেখা গেল; একদিকে নতুন ধরনের বড়লোক, অন্য দিকে জনসাধারণ। এই বিরোধই প্রকাশ পায় জিরোণ্ডিস্ট ও জ্যাকোবিনের লড়াইতে।

জিরোণ্ডিস্টরা ছিল বণিকব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি। এরা এসেছিল দেশের কিছুটা স্বচ্ছল অঞ্চলগুলি থেকে। জাতীয় পরিষদে এরাই ছিল সংখ্যায় ভারি। আর জ্যাকোবিনরা ছিল নিম্ন-মধ্যবিত্তদের প্রতিনিধি। এদের মধ্যে অধিকাংশই এসেছিল প্যারিস থেকে। এরা চাইত ব্যক্তিগত সম্পত্তির বেমালুম বিলোপ নয়, তার ওপরে যথাযথ খবরদারি। এই দুই দলের স্বার্থের সংঘাত ক্রমশই খোলাখুলি হয়ে দাঁড়াল।

ব্যাপারটা চরমে উঠল যখন ইউরোপের রাজারা জোট বেঁধে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করলেন। উদ্দেশ্য : এই বিপ্লবের দমন। ফ্রান্সের মানুষ তখন যে যা অস্ত্র পেল তাই নিয়েই শত্রুর মুখোমুখি হলো। কিন্তু তারা যখন শত্রুবাহিনীর হাতে প্রাণ দিচ্ছে সেই সময়েই ঘরের মধ্যে যে শত্রুর চর ক্রমাগত চক্রান্ত আঁটছে– এ ব্যাপার তাদের কাছে অসহ্য বোধ হচ্ছিল। তাই ১৭৯২ সালের আগস্ট মাসে তারা রাজপ্রাসাদের ওপরে চড়াও হয় আর শাসন পরিষদকে বাধ্য করে রাজার ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তাঁকে বন্দী করতে।

জিরোণ্ডিস্টরা প্রাণপণে চেষ্টা করছিল রাজাকে ও রাজতন্ত্রকে বাঁচাতে। কারণ বড়লোকদের বিরুদ্ধে গরিবদের আক্রোশ ঠাণ্ডা রাখার ঐ ছিল যোগ্য হাতিয়ার। কিন্তু জনসাধারণের চাপে ও জ্যাকোবিনদের অবিশ্রাম প্রচারের ফলে শেষ পর্যন্ত রাজতন্ত্র খতম হয়ে গেল। ১৭৯৩ সালের গোড়ায় রাজা ষোড়শ লুইকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো। আর জাতীয় পরিষদ ভেঙে দিয়ে তার জায়গায় সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গড়া হলো এক কনভেনশন বা সম্মেলন।

রাজতন্ত্রের ব্যাপার ছাড়াও কৃষক সমস্যা, খাদ্যের ব্যবস্থা, শুল্ক নীতি নিয়েও জিরোণ্ডিস্ট ও জ্যাকোবিনদের মধ্যে বিরোধ বাধল। প্রথম দল সম্পত্তির ওপর, অর্থাৎ নতুন বড়লোকদের সম্পত্তির ওপরে কোনোরকম খবরদারি মানতে রাজী হচ্ছিল না। তার ফলে ঘরে-বাইরে শত্রুর সঙ্গে লড়াই চালানো কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত ১৭৯৩ সালের মে মাসে জিরোণ্ডিস্টরা 'কনভেনশন' থেকে বিতাড়িত হলো। তারা তখন গ্রামাঞ্চলে গিয়ে কৃষকদের উস্কোতে থাকে প্যারিসের বিরুদ্ধে। এইভাবে শুরু হয় গৃহযুদ্ধ।

এই গৃহযুদ্ধের মধ্যেই জ্যাকোবিনদের নেতৃত্বে 'কনভেনশন' এক নতুন গঠনতন্ত্র গ্রহণ করে। এতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপরে বেশ কিছুটা কড়াক্কড়ি আরোপ করা হলো। জ্যাকোবিনরা জবরদস্তভাবে এই সব কানুন চালায় আর কঠোরভাবে শত্রুকে দমন করতে থাকে।

অবশ্য এই জবরদস্তির মধ্যেও ধনী-নির্ধনের পার্থক্য মেনে চলা হতো। বড়লোকদের বিরুদ্ধে বিশেষ করে প্রয়োগ করা হতো শক্তি। এর ফলে শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে বিপ্লবী বাহিনী জয়লাভ করতে থাকে।

কিন্তু সামাজিক সমস্যার কী করে সুরাহা করা যায় তাই নিয়ে জ্যাকোবিনদের নিজেদের মধ্যেই এই সময়ে গোলমাল শুরু হয়। এই দলের ভিতরে একদিকে ছিলেন ডানটনের মতো নেতারা, যাঁরা বিপ্লবের ফলে বেশ কিছুটা লাভবান হয়েছিলেন। তাঁরা তাই চাই-ছিলেন এবারে রণে ক্ষান্ত দিয়ে কিছুটা গুছিয়ে বসতে। আসলে এঁদের সঙ্গে জিরোণ্ডিস্টদের তেমন কিছু তফাত ছিল না। দলের মধ্যে রোবসপিয়ের,সেণ্ট জাস্টের মতো নেতারা ছিলেন খুবই প্রভাব-শালী। তাঁদের ছিল মাঝামাঝি অবস্থা। নিম্ন-মধ্য'বত্তদের সঙ্গেই ছিল তাঁদের যোগাযোগ। মারাত, হেবার্টের মতো নেতারা ছিলেন তাঁদের থেকেও চরমপন্থী (জাক রুস, ডার্লের মতো লোকেদের মতামত ছিল আরো চড়া ধরনের)। প্যারিসের আশেপাশেই সর্বস্বান্ত নিম্ন-মধ্যবিত্ত কারিগর ও ছোট দোকানীদের মধ্যেই ছিল তাঁদের প্রভাব। বাব্যুফের মতো সাম্যবাদী নেতার চিন্তায় পরে এঁরা প্রভাবিত হয়েছিলেন বেশ কিছুটা।

জিরোণ্ডিস্টদের হটানোর পরে জ্যাকোবিনদের নিজেদের মধ্যে যে গোলমাল বাধে তার কারণ হলো এটা। বিভিন্ন ধরনের স্বার্থের প্রতিনিধি সাধারণ শত্রুর বিপক্ষে একজোট হলেও নিজেরা কোনো কাজে হাত দিতে গেলেই বিপদ বাধে। হলোও তাই। রোবসপিয়ের-এর নেতৃত্বে জ্যাকোবিনরা প্রথমে জাক রুসের মতো চরমপন্থী নেতাদের খতম করে। মারাত-এর মতো প্রভাবশীল নেতাও এই সময়ে ঘাতকের হাতে মারা যান। তারপর রোপসপিয়ের ও ডানটনের দল হেবার্টের মতো চরমপন্থীদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। হেবার্টের অবশ্য কোনো স্পষ্ট সামাজিক বা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ছিল না। গৃহযুদ্ধের তীব্রতা কমে গেলেও তাঁর ঝোঁক ছিল জবরদস্তি চালিয়ে যাওয়ার দিকেই। তাঁর মৃত্যুদণ্ডের পর

রোবসপিয়ের ডানটনের মতো নরমপন্থী নেতাকেও ঐ শাস্তি দেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে রোবসপিয়েরকেও ঐ পথ ধরতে হয়—তাঁকে প্রাণ দিতে হয় গিলোটিনে।

এর ফলে ধনিকরাই আবার ক্ষমতা দখল করে বসে। তারা এর পরে পুরনো আমলকে যেমন ফিরিয়ে আনতে চায়নি, তেমনই আবার রাষ্ট্র-ক্ষমতা নিয়ে নিম্ন-মধ্যবিত্তের 'ছেলেখেলা' বরদাস্ত করতেও তারা রাজি ছিল না। তবু গোড়ায় গোড়ায় তাদের অনেক বাধা-বিপত্তিকে সামাল দিতে হয়। একদিকে রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনার আর একদিকে ১৭৯৩ সালের গঠনতন্ত্র চালু করার দাবি উঠতে থাকে। এমন একটা গোলমেলে অবস্থা থেকে রেহাই পাবার জন্যে ১৭৯৯ সালে ধনিকেরা নেপোলিয়ান বোনাপার্টকে গদিতে বসায়। একদিকে সাবেকী রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা আর একদিকে চরম গণতান্ত্রিক সংস্কার—এই দুইয়ের বিরুদ্ধে নেপোলিয়ন হলেন ধনিক-স্বার্থের রক্ষাকবচ।

বিপ্লবের এমন একটা পরিণতি যে ঘটতে পারল তার কারণ ১৭৮৯ সালের মে মাসে শুরু হওয়ার পর থেকে ১৭৯৪ সালের জুলাই মাসে রোবসপিয়ের-এর পতনের মধ্যেকার কয়েক বছরে ফ্রান্সে অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল। কৃষকেরা জমি দখল করে বসেছিল। বেদখল হওয়ার আশঙ্কা উপস্থিত হলে অবশ্য অন্য কথা, নইলে তারা আর বিপ্লব চালিয়ে যেতে চাইছিল না। ধনিকদের প্রভাব সমাজে যথেষ্ট বেড়ে উঠেছিল। নিম্নমধ্যবিত্তদের এক অংশও ফাটকাবাজি ও সৈন্যবাহিনীতে নানা মালপত্র জোগান দিয়ে বেশ দু-পয়সা করেছিল। তারাও তাই চাইছিল গুছিয়ে বসতে। অন্যদিকে জ্যাকোবিনদের মধ্যে ছিল নানা মুনির নানা মত, অথচ কারোর দৃষ্টিই তেমন স্পষ্ট ছিল না। এ সবের ফলেই সম্ভব হলো বিপ্লবের ঐ পরিণতি।

কামারের এক ঘা

ফরাসী বিপ্লবে দেশের রাজার মাথা ধুলোয় লুটিয়েছিল। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় তো অমন অগুনতি ঘটনার ছড়াছড়ি। ফরাসী বিপ্লবে তাই ওটা মোটেই বড় কথা নয়।

বড় কথাটা তবে কী? সেটা হলো—এ-বিপ্লব সাবেক কালের সমাজকে হটিয়ে নতুন এক সমাজ পত্তনের পথ খুলে দেয়। তাই শুধু ফরাসী দেশে নয়, ইউরোপের সব দেশেই, এমনকি সারা পৃথিবীতেই সেদিন এর ফলে নতুন আশা-ভরসা জাগে সমস্ত বঞ্চিত, সাধারণ মানুষের মনে। আর অন্য দিকে এ-বিপ্লব কাঁপুনি ধরায় সমস্ত রাজা-জমিদারদের হাড়ে হাড়ে।

সাবেক আমলের চেহারাটা কেমন ছিল? দেশের বেশির ভাগ জমিজমা ছিল রাজা, জমিদার, গির্জার পাদ্রীদের হাতে। তারই জোরে এরা দেশের লোকেদের ওপরে যেমন-খুশি কড়া শাসন চালাত। কিন্তু দেশশাসন বাবদ তাদের নিজেদের ট্যাঁক থেকে কানাকড়িও খসাতো না। খাজনা-ট্যাকসোর বোঝা অসহ্য ভারি হয়ে চেপে বসেছিল দোকানী, ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের ঘাড়ে। কারখানা গড়ে তোলার বা অন্য দেশের সঙ্গে খুশিমতো ব্যবসা-বাণিজ্য করার পথ বন্ধ ছিল মান্ধাতার আমলের বিধিনিষেধের বেড়াজালে। সব দিক থেকেই দেশের আসল মালিক ছিল বড় বংশের জমিদার আর পাদ্রী-পুরোহিতের দল। রাজা ছিলেন এদেরই প্রতিনিধি।

ইতিহাসে এরই নাম ফিউডালিজম বা সামন্ততন্ত্র। এ-ব্যবস্থাই ছত্রখান হয়ে ভেঙে পড়ে ফরাসী বিপ্লবের ঝাপটায়।

কিন্তু এই কি প্রথম? এর আগে কি ফিউডাল-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কোথাও ঘটে নি?

ঘটেছিল। এর প্রায় দেড় শো বছর আগে ইংল্যাণ্ডে একটা জোর ওলটপালট হয়। তার ফলে শেষ পর্যন্ত দেশশাসনের ভার এসে পড়ে বণিক, মহাজন আর নতুন এক ধরনের জমির মালিকদের হাতে। তবে সেখানে বনেদী ঘরের বড়ো মানুষদের কর্তৃত্ব একেবারে

হটানো হয় নি। বরং কিছুটা বোঝাপড়াই করা হয়েছিল তাদের সঙ্গে।

তারও প্রায় এক শো বছর আগে জার্মানিতে আর তারপর ইউরোপের অন্যান্য দেশে খুব বড় রকমের তোলপাড় ঘটেছিল। ঐ সময়ে সারা ইউরোপে ফিউডাল-ব্যবস্থার মস্ত জোরালো খুঁটি ছিল ক্যাথলিক গির্জা আর তার একচ্ছত্র নেতা ছিলেন পোপ। এদের জবরদস্তির বিরুদ্ধে সেদিন এক জোরালো ধর্মসংস্কার-আন্দোলন চলে। অন্যদিকে ফিউডাল জমিদারদের অকথ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে একের পর এক কৃষক বিদ্রোহও চলতে থাকে। এ-সবের ফলে সেকেলে সমাজব্যবস্থার ভিত অনেকখানিই আলগা হয়ে পড়ে। বেশ বোঝা যায় যে, একটা বড়ো রকমের রদবদল আর না হলেই নয়।

এই সব স্যাকরার খুটখাটের পরে কামারের এক ঘা হলো ফরাসী বিপ্লব।

ফরাসী বিপ্লবের ফলে অনেক মান্ধাতার আমলের আইনকানুন বাতিল হয়ে গেল। তাতে নানা দেশের সঙ্গে যেমন-খুশি ব্যবসা-বাণিজ্য করার পথও যেমন পরিষ্কার হলো, তেমনই আবার কলকারখানায় পুঁজি খাটানোরও সুযোগ মিললো অনেকখানি; অর্থাৎ বিপ্লবের ফলে প্রতিষ্ঠা হলো ধনতন্ত্রের।

ফিউডাল সামন্ততন্ত্রের জায়গায় ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল বলেই ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লবের অত নামডাক।

বিপ্লবের বাহন, বিপ্লবের দুশমন

এই সমাজব্যবস্থাকেই মজবুত করে তোলেন নেপোলিয়ন। একথা ঠিক যে ফরাসী বিপ্লবে রাজাদের হটিয়ে যে-প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নেপোলিয়ন তার জায়গায় ফের আবার সাম্রাজ্য ফিরিয়ে আনেন, নিজেই গদিতে চড়ে বসেন সম্রাট হিসেবে। এও ঠিক যে দেশশাসনের জন্যে জনসাধারণের প্রতিনিধি নিয়ে গড়া জাতীয় শাসন-পরিষদের বদলে তিনি নিজেকেই দেশের সর্বময় প্রভু করে তোলেন,

আর নানা দেশের ওপরে চাপিয়ে দেন তাঁর জবরদস্ত শাসনের জোয়াল। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে সাধারণ মানুষ যে-সব অধিকার অর্জন করেছিল এইভাবে নেপোলিয়ন তার অনেকটাই কেড়ে নেন। সেদিক থেকে নিশ্চয়ই তিনি বিপ্লবের দুশমন। তবু এসব সত্ত্বেও তাঁকে আবার বলব ধনতান্ত্রিক বিপ্লবের বাহনও। ১৮০৪ সালে তিনি যে 'প্রথম সাম্রাজ্যের' পত্তন করেন তাতে দেশ মোটের ওপর চলত বড় বড় ধনিকের স্বার্থে—আসলে নেপোলিয়নের আড়ালে থেকে তারাই নাড়ত দেশশাসনের কলকাঠি।

প্রমাণ? প্রমাণ নেপোলিয়ন দেশে 'কোড নেপোলিয়ন' নামে যে-আইন চালু করেন তার ধারাগুলি। এ-আইনের প্রায় ২০০০টি ধারার মধ্যে ৮০০টিতেই আছে কী করে সম্পত্তি রক্ষা করা যায় তারই ব্যবস্থা। সে-সম্পত্তি অবশ্য আগেকার দিনের ফিউডাল সম্পত্তি নয়, হাল আমলের ধনতান্ত্রিক সম্পত্তিই। 'কোড নেপোলিয়নে' সাতটিমাত্র ধারা ছিল শ্রমিকদের সম্পর্কে। তাতে তাদের দাবিদাওয়া আদায়ের জন্যে জোট বেঁধে ট্রেড ইউনিয়ন গড়া বা শেষ পর্যন্ত ধর্মঘট করা বে-আইনি গণ্য হলো। কিন্তু কোনো বাধা রইল না মালিকদের সংঘ গড়ার ব্যাপারে। এমন কথাও বলা হলো যে আদালতের সামনে মজুরি নিয়ে কোনো মামলা হাজির হলে মালিকের কথাই বিশ্বাস-যোগ্য ধরে নেওয়া হবে—মজুরদের কথা নয়।

নেপোলিয়ন মস্ত দিগ্বিজয়ী বীর। স্পেন থেকে শুরু করে মিশর পর্যন্ত সমস্ত দেশ তাঁর কাছে মাথা নোয়ায়। তার বিচিত্র কাহিনী আমরা অনেক শুনেছি। তাঁর অসংখ্য জয়লাভের পেছনে একটি ব্যাপার কিন্তু আমাদের নজর করা উচিত: 'সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা'র বাণীর সঙ্গে সঙ্গে 'কোড নেপোলিয়নের' ধারাগুলি নিয়ে নেপোলিয়নের বাহিনী যখনই কোনো দেশে অভিযান চালিয়েছে তখনই সেখানকার ধনিকেরা তাঁকে স্বাগতম জানিয়েছে। কারণ সে-আইনে মস্ত সুবিধে তাদেরই।

তবু একটা দেশে ধনিক আর কজন? যতই তাদের প্রভাব-

প্রতিপত্তি থাকুক, তাদের সমর্থনেই কি একটা দেশ জয় করা চলে ? আসলে শুধু ধনিক নয়, গোড়ায় গোড়ায় দেশের সাধারণ মানুষও নেপোলিয়নকে মেনে নিয়েছে ফিউডাল সমাজব্যবস্থার নানা বিধিনিষেধের কবল থেকে মুক্তি পাবার আশায়। নেপোলিয়নও সে-সব দেশে সাবেক আমলের ভূমিদাস-প্রথা তুলে দিয়েছেন, ব্যবস্থা করেছেন অবাধ বাণিজ্যের ; নানারকম ফিউডাল নজরানা আদায় বন্ধ করেছেন ; আর বণিক, কারখানা-মালিক ও অবস্থাপন্ন কৃষকদের দিয়েছেন খুশিমতো কেনা-বেচা করার অধিকার। এক কথায়, ফিউডাল জঞ্জাল হটিয়ে ঘরেবাইরে পুরোপুরি নতুন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা পত্তনের পথ অনেকখানি পরিষ্কার করে দিয়েছেন নেপোলিয়ন। সেই দিক থেকে তিনি হলেন বিপ্লবের বাহন ও নায়ক। নেপোলিয়নের ওপর তাই সেকেলে ফিউডাল ইউরোপের ভীষণ রাগ। তা ছাড়া, ইংল্যাণ্ড ধনতন্ত্রের পথে অনেক দূর এগিয়ে গেলেও নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধেছিল। কারণ, ফরাসীদেশে ধনতন্ত্রের প্রসার ইংল্যাণ্ড মোটেই সুনজরে দেখেনি। কেননা তাতে তার ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল ষোলো আনাই। তাই এরা সবাই মিলে লেগেছিল নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে।

তা ছাড়া আরো একটা ব্যাপার ছিল। নেপোলিয়ন যে-সব দেশ জয় করেছিলেন সেখানকার সাধারণ মানুষ ক্রমেই তাঁর জবরদস্ত শাসনের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে শুরু করে। এইভাবে বিদেশী অত্যাচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে সেই সব দেশে জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম জেগে উঠতে থাকে। ইতিহাসখ্যাত রাশিয়া অভিযানের সময়ে এই ব্যাপার চরমে ওঠে। এই সময় থেকেই আসলে শুরু হয় তাঁর পতন।

শেষপর্যন্ত ১৮১৪ সালে ইংরেজ ও প্রুশিয়ানদের হাতে নেপোলিয়নকে হার মানতে হয়। তাঁকে সুদূর সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত করে সাবেক আমলের রাজারাজড়া ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গেরা নেপোলিয়নের বিরাট সাম্রাজ্য নিজেদের মধ্যে ভাগবাঁটওয়ারা করে নিল। অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী কূটচক্রী মেটারনিশ ও রাশিয়ার

একচ্ছত্র সম্রাট প্রথম আলেকজাণ্ডারের নেতৃত্বেই এই সব বিলিব্যবস্থা হলো। ফের যাতে নেপোলিয়নের মতো কোনো আপদ ফিউডাল ইউরোপের আরামে ব্যাঘাত না ঘটায় তার জন্যে এইসব রাজা-রাজড়ারা নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করে নিল। তার প্রধান কথাটা এই যে, যে-বিলিব্যবস্থা হলো যদি কোনো দিক থেকে তাতে বিঘ্ন দেখা দেয়, অর্থাৎ সাবেক আমলের বিরুদ্ধে যদি কোনো বিদ্রোহের চেষ্টা হয়, তা হলে সবাই মিলে তা দমনের ব্যবস্থা করা হবে। ইতিহাসে এরই নাম 'পবিত্র মৈত্রী' **(Holy Alliance)**।

এই বিলিব্যবস্থায় ফ্রান্সের কী হাল হলো? যে বুর্‌বোঁ বংশের অত্যাচারী রাজারা ফরাসী বিপ্লবের ফলে সিংহাসন হারিয়েছিল তাদের হাতেই ফের সঁপে দেওয়া হলো দেশের শাসনভার। আর যে সব বড় ঘরের বড় মানুষেরা একদিন প্রাণ নিয়ে বিদেশে পালিয়েছিল, সুযোগ বুঝে তারাও আবার দেশে ফিরে এসে হারানো সম্পত্তির দখল পাবার চেষ্টা শুরু করল। শেষ পর্যন্ত কিন্তু কয়েক জায়গায় ছাড়া বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কিছুটা ক্ষতিপূরণ নিয়েই তাদের খুশি হতে হলো। কৃষকেরা মোটের ওপর তাদের নতুন-পাওয়া জমির দখল বজায় রাখতেই পারল।

কারণ, ইতিহাসের চাকা একবার ঘুরতে শুরু করলে তাকে শেষ অবধি ঠেকানো যায় না। ফরাসী বিপ্লব বা নেপোলিয়নের দিগ্বিজয় মোটেই একটা আচমকা ব্যাপার নয়। ফিউডাল-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কয়েকশো বছর ধরে যেসব বিদ্রোহের চেষ্টা দেখা যাচ্ছিল তাতে দিনের পর দিন এ-কথাটাই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে সমাজের একটা বড় রকম ওলটপালট আর না হলেই নয়। সেই ওলটপালটই হলো ফরাসী বিপ্লব।

এই সমাজবদলের তাগিদ আসছিল কোথা থেকে? ব্যবসা-বাণিজ্য, কলকারখানার ওপরে ভর করে ফিউডাল সমাজের বুকেই যে নতুন ধরনের এক শক্তির উদ্ভব হয়েছিল তার থেকেই। এই শক্তিকেই পদে পদে বাধা দিচ্ছিল সামন্ততন্ত্রের নানা বিধিনিষেধ।

কিন্তু ক্রমশ ঐ শক্তি ফুলে ফেঁপে উঠে ফাটল ধরাতে লাগল বনেদী সমাজের ভিতে। তিন-চার শো বছর ধরে বিদ্রোহের যে-সব চেষ্টা আমরা দেখলাম সেগুলি তারই ফল। আর এই শক্তিই পুরনো আমলের ভিত ধ্বসিয়ে নতুন ধনতান্ত্রিক সমাজ পত্তন করে ফরাসী বিপ্লবে। তাই 'পবিত্র মৈত্রী'র পাণ্ডাদের পক্ষে তাকে কিছুকালের জন্যে চাপা দেওয়া হয়তো সম্ভব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐ বিপ্লব যেসব রদবদল ঘটায় তাকে খেয়াল-খুশিমতো ফের আবার পালটানো একেবারেই অসম্ভব।

আরো এক বিপ্লব

ঐ নতুন শক্তি যে কি বিপুল তা সব থেকে ভালো বোঝা যায় উনিশ শতকের ইংল্যাণ্ডের দিকে তাকালে। আঠারো শতক থেকেই অবশ্য সেখানে এর শুরু। কিন্তু উনিশ শতকে পৌঁছে এ শক্তি এমন এক প্রবল, চমকপ্রদ রূপ ধরে যে ইতিহাসে তার নামকরণ হয়েছে—শিল্পবিপ্লব।

শিল্পবিপ্লব ব্যাপারটা কী?

শিল্পবিপ্লবের প্রথম কথা, সেকেলে হাতিয়ারের বদলে নতুন, উন্নত ধরনের কলকব্জা ব্যবহার। আঠারো শতকের শেষ দিক থেকে, বিশেষ করে উনিশ শতকে নতুন ঢঙের সুতো কাটার যন্ত্র, কলের তাঁত, বাষ্পীয় এঞ্জিন ও জাহাজ, লোহা গালাবার ও ইস্পাত তৈরির নতুন নতুন কায়দা, কয়লা তোলার উন্নততর পদ্ধতি—একটার পর একটা বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের ফলে ইংল্যাণ্ডে শুধু যে ব্যবসা-বাণিজ্য, যানবাহনের আশ্চর্য রকম প্রসার ঘটল তাই নয়, পত্তন হলো নতুন নতুন শিল্পের। মালপত্র তৈরির সেকেলে ঢং বেমালুম বদলে গেল আর তার ফলে বহুগুণ বৃদ্ধি পেল মালপত্রের পরিমাণ।

একটা নমুনা দেওয়া যাক। ১৮৩০ সালে ব্রিটেনে তৈরি হতো ৭½ লক্ষ টন লোহা। ১৮৭০ সালে তা বেড়ে দাঁড়াল ৬০ লক্ষ টনে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই শিল্পবিপ্লবের ফলে মানুষের বাঁচবার উপকরণগুলির পরিমাণ বিপুলভাবেই বেড়ে গেল। পুরনো পৃথিবীর সপ্তমাশ্চর্যও এই শিল্পবিপ্লবের কীর্তির পাশে তাই ম্লান হয়ে যায়। তাই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমস্ত দোষত্রুটি সত্ত্বেও এই কথাটি মনে না রাখা খুব ভুল হবে।

এ ছাড়াও কথা আছে। এই সব অতিকায় কলের কাজ ঘরে বসে চরকাকাটার মতো চলতে পারে না। এর জন্যে দরকার বড় বড় কারখানা। কাজেই ঘরে বসে তাঁত বা তকলি চালানোর জায়গায় বড় বড় মিল বা কারখানায় হাজার হাজার মজুর নতুন যন্ত্রপাতির সাহায্যে আগের চেয়ে ঢের বেশি মাল তৈরি শুরু করল। ফলে সে-সব মাল সস্তায় বিকোতে লাগল বেশ কিছুটা। চাষের কাজেও কল চলতে পারে যদি খেতের আয়তন বেশ কিছুটা বড় মাপের হয়। তাই দেখতে দেখতে বড় বড় কারখানা ও খেতের তৈরি মাল বাজার ছেয়ে ফেলল। আর অতিকায়দের দাপটে কোণঠাসা হতে হতে শেষ পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল খুদে ও ছোটরা।

এই প্রচণ্ড শক্তির তোড়ে ফরাসী বিপ্লবের মতো ইংল্যাণ্ডেও তবে বিপ্লব ঘটল না কেন?

কারণ আগেই বলেছি, এর প্রায় দেড় শো বছর আগে থেকেই সেখানে একটা ওলটপালটের ফলে দেশশাসনের ভার এসে পড়ে বণিক, মহাজন ও নতুন ধরনের জমির মালিকের হাতে—তবে বনেদী বড় ঘরের মানুষের কর্তৃত্ব সেখানে একেবারে হঠানো হয়নি—খানিকটা আপোষেই ঘটেছিল। কাজেই, শিল্পবিপ্লবের জোয়ার যখন এলো তখন ইংল্যাণ্ডের সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থা তার পথে তেমন বাধা হয়ে দাঁড়াল না। যতটুকু অদলবদলের দরকার পড়ল তা চলতি সমাজ বা রাষ্ট্র-কাঠামোর মধ্যেই সম্ভব হলো। তার নমুনাও একটু পরেই পাওয়া যাবে।

গোড়ায় গোড়ায় ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে আর তারপর ইউরোপের বাইরের জগতের সঙ্গেও ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমাগত বেড়ে

উঠছিল।' এর জন্য বণিক্-সওদাগরেরা প্রথম প্রথম কারিগরদের কাছে মালপত্র কিনে বিদেশে চালান দিত। ক্রমে চাহিদা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তারা কারিগরদের আগাম দিয়ে বা কাঁচামাল জুগিয়ে তৈরি মালপত্র একটা নির্দিষ্ট দরে কিনে নিতে লাগল। এই সবের মধ্যে দিয়ে চোদ্দ শতক থেকে যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উন্মেষ হয়েছিল শিল্পবিপ্লবের ফলে তাই আরো পরিণত রূপ ধারণ করল। কারিগরেরা এখন আর ব্যবসায়ীদের ফরমাশমতো ঘরে বসে মাল বানায় না বা বানাবার পর ওগুলিকে নিজের জিনিস হিসাবে ব্যবসাদারদের কাছে বেচে না। শিল্পপতির বিরাট কারখানায় এখন সে তারই মতো আরো হাজার হাজার লোকের সঙ্গে মিলে যে-মাল তৈরি করে তা আর তার বা তার মতো অন্য দশজনের সম্পত্তি নয়, মালিকের সম্পত্তি। অর্থাৎ, এখন আর সে স্বাধীন কারিগর নয়—মজুর।

শিল্পবিপ্লবের পরে যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বেশ পাকাপোক্ত হয়ে বসল তার আসল চেহারাটা কেমন?

একদিকে পুঁজির মালিক আর একদিকে সর্বস্ব-খোয়ানো মজুর—এই দুইয়ে না মিললে এ ব্যবস্থা চলতে পারে না। মজুরের নিজের বলতে তার গতরখানা ছাড়া আর কিছু নেই। তাই নেহাত প্রাণ বাঁচানোর তাগিদেই তাকে অগত্যা ধনিকদের দ্বারস্থ হতে হয়। সেখানে সে তার একমাত্র সম্পত্তি—গতর খাটানোর শক্তি—মজুরির বদলে কারখানা মালিকদের কাছে বেচে। ফলে, মালিকের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে সে যা মালপত্র বানায় তা আর তার নিজের নয়, মালিকেরই সম্পত্তি। অবশ্য এর সবটাই মালিকের ভোগে আসে না। কারণ এর ভেতর থেকেই উশুল হয় মজুরের মজুরি, অর্থাৎ তার কোনক্রমে সপরিবারে খেয়ে-পরে টিকে থাকার মতো আয়। এর বেশি—উপরি—যেটা থাকে সেটাই হলো মালিকের লাভ বা মুনাফা। এই মুনাফা পকেটস্থ করেই ধনিক তার পুঁজি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলে, আরো বেশি যন্ত্রপাতি ও মজুর খাটিয়ে আরো মুনাফা কামায়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার এই হলো আসল চেহারা।

শিল্পবিপ্লবের সময়ে ইংল্যাণ্ডে মজুরদের দুর্গতির সীমা ছিল না। পনেরো, ষোলো ঘণ্টার হাড়ভাঙা খাটুনি খুবই স্বাভাবিক ছিল। কারখানাগুলি ছিল আলোবাতাসহীন জেলখানার মতো আর মজুরদের বস্তিগুলি অস্বাস্থ্যকর নরকবিশেষ। এর ওপরে মজুরি ছিল যৎসামান্য। তাও আবার আরো কম দেওয়া চলে বলে মেয়েদের, এমন কি পাঁচ-ছ বছরের শিশুদেরও, কারখানায় জোর করে পনেরো-ষোলো থেকে উনিশ-কুড়ি ঘণ্টা পর্যন্ত খাটানো হতো। একদিকে মজুরদের এই হাল, আর একদিকে মালিকদের বিপুল আয়—ধনতান্ত্রিক শোষণের এই চেহারা দিন-কে-দিন স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

পরে অবশ্য কোনো কোনো দিক থেকে মজুরদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটে। কারখানা-আইন জারি করে মজুরদের খাটুনির সময় বেঁধে দেওয়া হলো। মজুরদের একজোট হওয়ার অধিকারও মানা হলো শেষ পর্যন্ত।

হঠাৎ মালিকদের সুবুদ্ধি উদয় হওয়ার দরুনই কি এ সব হলো? মোটেই না। আসল কারণ, অবস্থা এমনভাবে চললে মজুরেরা যে বেশিদিন আর মুখ বুঁজে সব অত্যাচার-অনাচার সইবে না—এমন লক্ষণ মালিকেরা ক্রমেই বেশি বেশি দেখতে পাচ্ছিল। তাই ভয়ঙ্কর একটা বাড়াবাড়ি পাছে ঘটে যায় এই ভয়ে তারা নিজেরাই অবাধ শোষণের লোভ কিছুটা সামলে নিল।

যন্ত্রভাঙা, জোটবাঁধা

শ্রমিক জাগরণের একটা লক্ষণের কথা বলি। শোষণে ও অত্যাচারে দিশাহারা হয়ে ১৮১১ সাল নাগাদ ইংল্যাণ্ডের হাজার হাজার মিস্ত্রি-কারিগর কারখানার যন্ত্রপাতি ভাঙতে শুরু করে। তারা ভেবেছিল ঐ যন্ত্রই বুঝি তাদের দুঃখ-দুর্দশার কারণ—সেটাই বুঝি তাদের দুশমন। সদ্য ঘুমভাঙার দরুন কলের পেছনকার মালিক বা ঐ ব্যবস্থার আসল রূপ তারা তখনো ধরতে পারেনি। তাই তাদের সেদিন এমন ভুল সম্ভব হয়েছিল। সে যাই হোক, দেখতে দেখতে এই যন্ত্রভাঙার

রেওয়াজ শহর থেকে শহরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ইতিহাসে এর পরিচয় 'লাড্ডাইট আন্দোলন' নামে চালু।

ইংরেজ মালিকদের মধ্যে 'সামাল' 'সামাল' রব উঠল। বহু লোককে ফাঁসিতে লটকিয়ে, জেলে পুরে, চরম অত্যাচার চালিয়ে অবশেষে এ-আন্দোলনকে সেদিন দাবানো সম্ভব হয়। ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত কবি লর্ড বায়রন সেদিন লর্ডসভায় লাড্ডাইটদের পক্ষ নিয়ে অনেক লড়ালড়ি করেন। কিন্তু আতঙ্কগ্রস্ত মালিকেরা তাঁর কথায় সেদিন কর্ণপাত করেনি।

একটা জিনিস লক্ষ্য করার মতো। যেখানেই মালিকেরা কল-কারখানা বসানো শুরু করেছে সেখানেই গোড়ায় গোড়ায় এই ধরনের যন্ত্রভাঙার চেষ্টা অল্পবিস্তর দেখা গেছে। পরে মজুরেরা যখন জোট বেঁধে তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে লড়াই শুরু করেছে আর তার ফলে যখন তাদের ভাবনাচিন্তা খানিকটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে, তখন আর এমন ব্যাপার চোখে পড়েনি।

ইংল্যাণ্ডে তখনকার মতো মজুরদের দমানো গেলেও অসন্তোষের মূল কারণটা কিন্তু দূর হলো না। তারা ঠেকে শিখল যে যন্ত্রপাতি তচ্‌নচ্‌ করে তাদের দুর্গতি মিটবে না, বরঞ্চ বাড়বেই। তাই এবার তারা ঝুঁকলো একসঙ্গে কাজ বন্ধ বা ধর্মঘট করার দিকে, আর তারই জন্যে জোট বাঁধবার বা ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার দিকে। এও কিন্তু সহজে হলো না। বহুদিন এই রকম জোট বাঁধা বা সে-উদ্দেশ্যে পরস্পরের সঙ্গে চিঠিপত্র লেখাও বে-আইনি ছিল। অনেক লড়াইয়ের পর ইংরেজ মজুরেরা শেষ পর্যন্ত ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার অধিকার লাভ করে ১৮২৫ সালে।

এসব থেকে এমন কথা কি ধরে নেওয়া চলে যে, এর পর থেকে ইংরেজ মজুরেরা নিজেদের পথ ধরল? না, তা চলে না। ধনিকেরা নানা প্যাঁচ কষে বার বার মজুর আন্দোলনকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে ব্যবহার করে এসেছে। ইংল্যাণ্ডে আজও এর জের পুরোপুরি কাটেনি।

একটা নমুনা যাচাই করা যাক। শিল্পবিপ্লবের ফলে অনেক নতুন নতুন ঘনবসতিভরা শহর গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তাদের বাসিন্দাদের কোনো ভোটাধিকার, অর্থাৎ পার্লিয়ামেণ্টে প্রতিনিধি পাঠাবার অধিকার ছিল না। অথচ এককালে হয়তো বর্ধিষ্ণু, কিন্তু পরে জনবিরল অনেক গ্রাম্য এলাকার সে অধিকার ছিল। ফলে এমনও হয়েছে যে ঐ রকম কোনো এলাকায় হয়তো একজন মাত্র লোকেরই ছিল ভোটাধিকার। সেই একজনই সভা ডেকে গম্ভীরভাবে নিজেই নিজের নাম প্রস্তাব করে পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য হতে পেরেছে। বলা বাহুল্য, জমির মালিকদের এ ব্যবস্থা খুবই পছন্দসই ছিল। কারণ এতে তাদের দেশশাসনের ব্যাপারে নিজেদের কোলে ঝোল টানার সুবিধা হতো।

কলকারখানার মালিকদের কিন্তু এমনটা মোটেই মনঃপূত ছিল না। কারণ তাদের বসবাস যে শহরগুলিতে, তার বাসিন্দাদের ভোট না থাকায় মালিকেরা পার্লিয়ামেণ্টে নিজেদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে ঠিক আপন সুবিধামতো আইন পাশ করাতে পারছিল না। তাই আসলে দেশশাসনের ব্যাপারে নিজেদের প্রতিপত্তি বাড়াবার জন্যে তারা গণতন্ত্রের দোহাই পেড়ে বললো, 'শহরগুলিকে ভোটাধিকার দাও'। আর সে দাবি যাতে আদায় করা যায় তার জন্যে মালিকেরা এর পেছনে শহরের মজুরদেরও টানল, ভোটাধিকারের লোভ দেখিয়ে। তার ফলে বছর কয়েকের আন্দোলনের পর ১৮৩২ সালে পাশ হলো ভোটাধিকার-সংস্কার আইন। তাতে অনেক জনবিরল গ্রামাঞ্চলের ভোট কাটা গিয়ে ভোটাধিকার পেল নতুন শহরগুলি।

কিন্তু শহরের সবাই, অন্তত বয়স্ক সকলেই, কি এ অধিকার পেল? মোটেই না। নতুন আইনে সাব্যস্ত হলো যে শহরবাসীদের মধ্যে যারা বছরে অন্তত ১৩৫ টাকার মতো বাড়িভাড়া দেয় তাদেরই শুধু জুটবে এ অধিকার। মনে রাখা দরকার যে, ১৮৩২ সালের ১৩৫ টাকা আজকের দিনে তার বহুগুণ বেশি টাকার সমান। তাই আসলে সংস্কার আইনের ফলে ভোট মিললো মাত্র ১,৩০,০০০

লোকের। আর যে মজুর মালিকদের গলা-বাজিতে ভুলে পথেঘাটে লড়াই করে মরল তার কপালে জুটল অষ্টরম্ভা।

এতেও হলো না। বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো অত বড় ঠকামির পরেও মালিকেরা ১৮৩৪ সালে পাশ করল নতুন এক 'দুঃস্থ আইন'। তাতে চরম দুর্গত কারিগর, মজুর বা ঐ ধরনের লোকেরা সরকারী তহবিল থেকে এতদিন যেটুকু সাহায্য পাচ্ছিল তাও কমিয়ে দেওয়া হলো অনেকখানি।

ছয় দাবির লড়াই

এই সব থেকে মজুরেরা কিছুটা আঁচ করল যে নিজেদের জোট মজবুত করে আপন পথ না ধরতে পারলে ধনিকদের পেছনে ছোটাই সার হবে। ১৮৩৬ সালে তাই উইলিয়াম লভেট নামের একজন মিস্ত্রির নেতৃত্বে লণ্ডনের কারিগর ও মজুরেরা 'লণ্ডন মজুর সংঘ' গড়ে তুলল। এই সংঘের দাবি ছিল ছটি: ১) প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষমাত্রেরই ভোটের অধিকার, ২) বছর বছর পার্লিয়ামেণ্ট নির্বাচন, ৩) গোপন ভোট, ৪) সমান মাপের নির্বাচনী এলাকা, ৫) পার্লিয়ামেণ্ট সদস্যের বেতনের ব্যবস্থা (কারণ তা হলে গরিব মানুষও নির্বাচনে দাঁড়াতে ভরসা পাবে) ও ৬) পার্লিয়ামেণ্ট সদস্যদের পক্ষে সম্পত্তির মালিকানার শর্ত বিলোপ।

এই ছটি দাবি নিয়ে দেখতে দেখতে সারা দেশে বিরাট এক আন্দোলন শুরু হলো। এই ছয় দাবি নিয়েই হলো **People's Charter** বা জনসাধারণের দাবির সনদ। আর এর থেকেই এই আন্দোলন ইতিহাসের পাতায় 'চার্টিস্ট আন্দোলন' নামে পরিচিত।

আন্দোলন শুরু হয় ১৮৩৭ সালে। লভেট, ও'কোনর, ও'ব্রায়েন, হার্নে, জোনস, ভিনসেণ্ট, ফ্রস্ট-এর মতো নেতারা সারা দেশময় সভা ডেকে সর্বসাধারণকে দেখিয়ে দিলেন, এ-দাবির ন্যায্যতা। হাজার হাজার মজুর তাদের কাজের পোশাকেই মশাল হাতে রাস্তায় নামল বিক্ষোভ দেখাতে। ১৮৩৮ সালে ঠিক করা হলো, এই দাবির পক্ষে

কাগজে লক্ষ লক্ষ সই জোগাড় করে পার্লিয়ামেণ্টের কাছে পাঠানো হবে জাতীয় দাবি হিসাবে এও স্থির হলো যে, এ-দাবির ভিত্তিতেই পরের বছর লণ্ডনে সারা দেশের প্রতিনিধি নিয়ে জাতীয় সম্মেলন ডাকা হবে।

একটা জিনিস নজর করার মতো। এই দাবির সবগুলিই হচ্ছে সাধারণ রাজনৈতিক দাবি। এর মধ্যে মজুরদের নিজস্ব অর্থনৈতিক বা সামাজিক দাবিদাওয়া ঠাঁই পায়নি। এটা এক দিক থেকে এর সীমাবদ্ধতা। তবে এও ঠিক যে এর থেকেই প্রমাণ হয়, মজুরেরাই গণতান্ত্রিক লড়াইয়ের সবচেয়ে আগুয়ান সৈনিক। তা ছাড়া মজুরেরা এ-আন্দোলনে অগ্রণী হলেও এর মধ্যে যে অসংখ্য মিস্ত্রি, কারিগর, মধ্যবিত্ত, পার্লিয়ামেণ্টের চরমপন্থী সদস্য, এমনকি কিছু কিছু মাঝারি-গোছের ধনিকেরও সমাবেশ হয়েছিল তাদের জোট অটুট ও মজবুত রাখার পক্ষে এই-ই হয়তো ছিল সব থেকে উপযুক্ত দাবি। আন্দোলনের বিপ্লবী নেতা হার্নের মতো অনেকেই তখন ভাবতেন: "আমরা সর্বজনীন ভোটাধিকার চাই, কারণ আমরা তার অধিকারী। আর শুধু অধিকার আছে বলেই নয়, এই ভোটাধিকার আমাদের দেশকে দেবে স্বাধীনতা আর আমাদের ঘরে ঘরে আনবে সুখশান্তি, কারণ আমাদের বিশ্বাস এর ফলে আমাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হবে-ই।"

দাবিতে সই জোগাড় করে তো পাঠানো গেল, কিন্তু পার্লিয়ামেণ্ট যদি তা অগ্রাহ্য করে তবে আমরা কি করব?—চার্টিস্টদের মধ্যে এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা চলে। এর জবাবে কেউ বলে সাধারণ ধর্মঘটের কথা, কেউ বা তুললো সশস্ত্র বিপ্লবের কথা। তাতে ঘাবড়ে গিয়ে একদল ধনিক সদস্য সরেও পড়ল। অনেক তর্কাতর্কির পর সাব্যস্ত হলো—এ নিয়ে এখন মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই, তবে জনসাধারণের নিশ্চয়ই অস্ত্রধারণের আর আত্মরক্ষার অধিকার আছে।

কিছুদিনের মধ্যেই পুলিস ও ফৌজের সঙ্গে চার্টিস্টদের সংঘর্ষ বাধল। ওদিকে আবার প্রায় ১৫ লক্ষ সইসমেত দাবির আবেদন

পার্লিয়ামেন্টে অগ্রাহ্য হওয়ায় আগুনে ঘি পড়ল। বার্মিংহাম শহর প্রায় দিন তিনেক রইল জনসাধারণের হাতে। শেষ পর্যন্ত বেপরোয়া গুলি চালিয়ে ও চার্টিস্টদের গ্রেপ্তার করে সরকার কিছুদিনের মতো আন্দোলনকে থামাতে পারল।

তবু আন্দোলন একেবারে নিভল না। ১৮৪০ সালে গঠিত হলো 'জাতীয় চার্টিস্ট সংঘ' আর তার শাখা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। চার্টিস্ট বন্দীদের মুক্তির দাবি করে যে স্বাক্ষর-সংগ্রহ-অভিযান চলল তাতে সই পাওয়া গেল বিশ লক্ষ। পার্লিয়ামেন্টে এই দাবি মানা না-মানার প্রশ্নে দু-পক্ষে সমান ভোট হওয়ায় সভাপতি বিশেষ ভোট দিয়ে একে অগ্রাহ্য করল। মজুরদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক দাবিসমেত আর একটি আবেদনও ৩৩ লক্ষ লোকের—অর্থাৎ তখনকার দিনে দেশের অধিকাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের—স্বাক্ষর পাওয়া সত্ত্বেও এইভাবে নাকচ হয়ে গেল।

এর মধ্যে আর-এক ব্যাপার হলো। ইংরেজ মিলমালিকেরা তাদের কারখানার প্রয়োজনীয় কাঁচামাল জোগাড় করত বিদেশ থেকে, কিন্তু ইংল্যাণ্ডে তখন 'শস্য আইন' চালু থাকায় ঐ কাঁচামাল আমদানির ওপরে বেশ মোটা ট্যাকসো দিতে হতো। ফলে তার দর যেত চড়ে। মিলমালিকরা তাই সস্তায় কাঁচামাল পাবার জন্যে 'শস্য আইন-বিরোধী সংঘ' তৈরি করে হৈ চৈ শুরু করল ঐ আইন বাতিলের জন্যে। ঝোপ বুঝে কোপ মারতে তারা চিরদিনই ওস্তাদ। কিছুদিন ধরে তারা মজুরদের মধ্যে চার্টিস্ট আন্দোলনের জোয়ার লক্ষ্য করছিল। তারা এবার মতলব ঠাওরাল, মজুরদের ভেতরকার এই আলোড়নকে নিজেদের কাজ হাসিলে লাগাতে হবে। মজুরদের কাছে তারা তাই লোভ দেখাল, শস্য আইন রদ হলে তোমাদের সস্তায় রুটি মিলবে। কিন্তু তার দরুন মজুরি কাটার চেষ্টা হবে কিনা সে সম্পর্কে তারা উচ্চবাচ্য করল না। মজুরদের আন্দোলনে নামানোর জন্যে তারা কারখানা বন্ধ পর্যন্ত করে দিতে লাগল। এর ফলে সারা দেশে ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি যে ট্রেড ইউনিয়নগুলি

সরাসরি চার্টিস্ট আন্দোলনে যোগ দেয় নি তারাও এবার আন্দোলনে নামে। চারিদিকে রব ওঠে সাধারণ ধর্মঘটের।

চার্টিস্টরা গোড়ায় গোড়ায় ধনিকদের কারসাজি বলে এই আন্দোলনে যোগ দেয় নি। তারাও কিন্তু ক্রমে এতে জড়িয়ে পড়ে আর ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে একযোগে ডাক দেয় 'পবিত্র মাস' পালনের, অর্থাৎ এক মাস ধরে সাধারণ ধর্মঘটের। কিন্তু সত্যই তার বন্দোবস্ত তেমন ছিল না—নেতৃত্বের মধ্যেও দোটানা ছিল। তাই সরকার যখন বেপরোয়া অত্যাচার শুরু করল তখন আন্দোলন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। ১৫০০ লোক গ্রেপ্তার হলো—৫৪ জনের হলো যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

এর পর মজুরদের মধ্যে হতাশা দেখা দেয়। বড় বড় নেতারা পর্যন্ত আন্দোলন ছেড়ে চলে যেতে থাকে। চার্টিস্ট সংঘের সভ্যসংখ্যা দ্রুত কমতে থাকে। রাজনৈতিক আন্দোলন ছেড়ে মজুরেরা নিছক ট্রেড ইউনিয়ন ও সমবায় আন্দোলনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তারা নানা আজগুবি ও হাতুড়ে মতামতেরও পাল্লায় পড়ে ঐ সময়ে।

১৮৪৮ সালে ফরাসী দেশের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ধাক্কায় আর একবার অবশ্য চার্টিস্ট আন্দোলনের মরা গাঙে বান আসে। কিন্তু সেবারও প্রচণ্ড অত্যাচারের মুখে আন্দোলন ক্রমে নিঃশেষ হয়ে যায় শেষ পর্যন্ত।

চার্টিস্ট আন্দোলন তখনকার মতো ব্যর্থ হলেও একথা পরিষ্কার বোঝা দরকার যে, তার ছটি দাবির প্রায় প্রত্যেকটিই যে পরে পূরণ হতে পেরেছে তার কারণ ঐ আন্দোলন। পৃথিবীর ইতিহাসে এই হচ্ছে মজুরদের প্রথম নিজস্ব রাজনৈতিক আন্দোলন। সাধারণ গণ-তান্ত্রিক দাবিদাওয়া নিয়ে এই প্রথম মজুরেরা সমাজের অন্যান্য নিপীড়িত মানুষের সঙ্গে জোট বেঁধে লড়াই চালালো। এটাই তার অক্ষয় কীর্তি।

চার্টিস্টদের অত বড় চেষ্টা ব্যর্থ হলো কেন? কারণ যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সেদিন ইংরেজ মজুরেরা লড়েছিল তখনও তার দম

ফুরোয় নি—তখনও তা উঠতির, বাড়তির মুখে। আর মজুরেরাও তখন পর্যন্ত লড়াইয়ের আগুনে পুড়ে পোক্ত হয়ে ওঠে নি—কেমন করে লড়াই চালাতে হয় তার অভিজ্ঞতাও তাদের অর্জন করা হয় নি। তখনও তারা একটা স্পষ্ট, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির অধিকারী হয় নি। তাই তাদের নেতৃত্বের মধ্যে বারবার দোটানা ও মতভেদ দেখা গেছে। সংশয়, দুর্বলতা ও বিভ্রান্তি শেষ অবধি ব্যর্থ করেছে অত বড় গণআলোড়ন।

তা হলেও কিন্তু চার্টিস্ট আন্দোলনের শিক্ষা, তার সাফল্য ও ব্যর্থতার শিক্ষা, পরের দিনের মজুরেরা কখনও ভোলে নি। চার্টিস্টদের সময়ে যা আবছায়া ছিল, ক্রমে নতুন বৈজ্ঞানিক চিন্তার আলোয় তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। হার্নে ও জোনস-এর মতো চার্টিস্ট নেতারাই পরে সঠিক পথের দিশা পেয়েছেন।

"জমি যারা চাষ করে তারাই হবে জমির মালিক: যারা ফসল ফলায়, সে ফসল সবার আগে তাদেরই ভোগে আসবে: ইমারত গড়ে যারা, তারাই সেখানে বসবাস করবে—অলস ছাড়া কেউই অনাহারে মরবে না—শয়তান ছাড়া কাউকেই সইতে হবে না অপমান" —চার্টিস্ট নেতা হার্নের এই মহৎ বাণী পরের যুগের মানুষকে নতুন প্রেরণা দিয়েছে।

এ-সব ঘটনা থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা আসর গেড়ে বসার সঙ্গে সঙ্গেই সমাজে আবির্ভাব হয় নতুন এক ধরনের মানুষ—মজুর। এরাই হলো ধনতান্ত্রিক শোষণের শিকার। আর তাই সে-শোষণব্যবস্থার বিরুদ্ধে তারাই সব থেকে আগুয়ান সৈনিক।

এই মজুরশ্রেণীর জন্ম, ক্রমবিকাশ, সংঘবদ্ধতা ও দুনিয়াজোড়া জয়যাত্রাই হচ্ছে গত এক শো বছরের ইতিহাসের সার কথা।

'পবিত্র মৈত্রী'র ইমারতে ফাটল

ইংল্যাণ্ডে শুরু হলেও শিল্পবিপ্লবের ধাক্কা অন্যদেশেও পৌঁছলো। ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, জার্মানি, আমেরিকা—দেখতে দেখতে সব দেশেই অল্পবিস্তর এর ছোঁয়াচ লাগল।

ইংল্যাণ্ডে তো দেড় শো বছর আগেই রাষ্ট্রব্যবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে শিল্পবিপ্লবের সামাল দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব হয় নি। অন্য দেশগুলিতে কিন্তু ব্যাপার অন্য রকম দাঁড়াল। দেশ-শাসনের ভার অনেকখানিই থেকে গিয়েছিল সেকেলে বনেদী জমিদার, পাদ্রী ও রাজা-রাজড়াদের হাতে। আর এই ব্যবস্থায় যাতে কোন বাধা না পড়ে তার জন্য রাশিয়ার একচ্ছত্র সম্রাট প্রথম আলেকজাণ্ডার ও অস্ট্রিয়ার কূটচক্রী মন্ত্রী মেটারনিশ 'পবিত্র মৈত্রীর' এক বিশাল ইমারত খাড়া করেছিলেন। সনাতন ব্যবস্থার গায়ে কোনখানে আঁচড়টি পড়লে সবাই মিলে সে 'অনাসৃষ্টিকে' দমাতে হবে, এই ছিল 'পবিত্র মৈত্রী'র পাণ্ডাদের সিদ্ধান্ত। তাই ইউরোপের দেশগুলিতে রাষ্ট্রব্যবস্থার কোন অদলবদলের চেষ্টা মোটেই সহজ ব্যাপার ছিল না ঐ সময়।

মেটারনিশের 'পবিত্র মৈত্রী'র ইমারতে প্রথম ফাটল ধরল কিন্তু কিছুটা আচমকাভাবে। দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনের মস্ত রাজত্ব ছিল। সেখানে ১৮২০ সালে সাইমন বলিভার নামে একজন দেশ-প্রেমিকের নেতৃত্বে স্পেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়। কিছুদিনের মধ্যেই বিদ্রোহ এমন প্রচণ্ড হয়ে দাঁড়াল যে স্পেন একলা তার সামাল দিতে পারল না। তখন সে ইউরোপের অন্যান্য দেশের সাহায্য চাইল 'পবিত্র মৈত্রী'র দোহাই পেড়ে। বিপ্লবের চিরশত্রু মেটারনিশ তখনই রাজী হলেন সৈন্যসামন্ত পাঠিয়ে স্পেনের জমিদারি সামলাতে। কিন্তু ব্রিটেন দেখল জাহাজে করে দূর দেশে এভাবে সৈন্য চালান দেওয়া শুরু হলে সমুদ্রের বুকে তার যে-আধিপত্য রয়েছে তা বিপন্ন হবে। তাই বাণিজ্য ও নৌবাহিনীর একাধিপত্যের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভয়ে সে বেঁকে বসল।

কিন্তু সরাসরি এ-প্রস্তাবের বিরোধিতা করল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। প্রথমত সে ঐ 'পবিত্র মৈত্রীর' চুক্তির মধ্যে ছিল না। তারপর পাছে হাতের কাছের এত বড় বাজারটা হাতছাড়া হয়, তাই ১৮২৩ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট মনরো স্পষ্টাপষ্টি জানিয়ে দিলেন যে পশ্চিম গোলার্ধে এইভাবে ইউরোপের নাক গলানো আমেরিকা বরদাস্ত করবে না। ইতিহাসে এরই নাম 'মনরো নীতি'। যাই হোক, এর ফলে শেষ পর্যন্ত মেটারনিশকে নিরস্ত হতে হলো আর দেখতে দেখতে সাইমন বলিভারের নেতৃত্বে দক্ষিণ আমেরিকার দেশ-গুলি স্পেনের কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারল। ঐ বলিভারের নামে সেখানকার একটি দেশের নাম হয়েছে বলিভিয়া।

কিন্তু 'পবিত্র মৈত্রী'র বিলিব্যবস্থার ওপরে সত্যিকারের ঘা পড়ল আরো পরে—ইউরোপের নানা দেশের জনসাধারণের তরফ থেকেই। মোক্ষম ঘা এলো ১৮৩০ সালের জুলাই মাসে ফরাসীদেশে।

বুর্‌বোঁ বংশের রাজারা মেটারনিশের কৃপায় সিংহাসনে চড়ে জমিতে পুঁজি খাটায় এমন ৮০,০০০ সব-থেকে-বড় ধনিককে ভোটাধিকার দেয়। কিন্তু নেপোলিয়নের আমলে যে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল তাদের সমস্ত ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা হয়। অথচ টাকাকড়ির জোরের দিক থেকে এরা ক্রমেই বেশ প্রভাবশালী হয়ে উঠছিল। অন্যদিকে এই সময়ে ফরাসী জন-সাধারণের দুর্দশার সীমা ছিল না। বুর্‌বোঁদের অপদার্থ শাসন ক্রমেই সকলের কাছেই অসহ্য বোধ হচ্ছিল।

এমন অবস্থায় ১৮৩০ সালের জুলাই মাসে ফ্রান্সে এক বিপ্লব ঘটল। প্যারিসের মজুর, ছাত্র ও মধ্যবিত্তেরা মিলে কয়েকদিন লড়াইয়ের পর বুর্‌বোঁ বংশকে সিংহাসনছাড়া করল। কিন্তু তার জায়গায় ফের আবার প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো না। সিংহাসনে চড়-লেন অর্‌লিয়ান্স বংশের লুই ফিলিপ্পি। এঁর নজর গোড়ার থেকেই ছিল ব্যাঙ্কমালিক বড় বড় ধনিকদের স্বার্থের দিকেই। তাই লাফিত্‌ নামে এক ব্যাঙ্কমালিক তাঁর প্রধানমন্ত্রী হয়েই স্পষ্ট জানালেন,

"এবার শুরু হবে ব্যাঙ্কমালিকদের রাজত্ব।" অর্থাৎ ধনিকদের মধ্যেই দেশশাসনের ভার আর কিছুটা ছড়িয়ে দেওয়া হলো।

মজুরেরা কিন্তু চোখ বুঁজে ওপরতলার বিলিব্যবস্থা মানতে রাজী হলো না। তাই দেখা গেল, ১৮৩১ সালে মজুরেরা বিপ্লবী অভ্যুত্থান মারফত ফরাসী রেশম-শিল্পের কেন্দ্র লিয়ঁ শহর দখল করে রেখেছে তিন দিনের জন্তে। তারপর অবশ্য চরম অত্যাচার চালিয়ে তাদের দমন করা হয়। অথচ তারা সেদিন চেয়েছিল মস্ত কিছু নয়—কোন-ক্রমে সপরিবারে টিকে থাকার মতো কাজ ও মজুরি। ১৮৩৪ সালে আবার সেখানে অভ্যুত্থানের চেষ্টা নৃশংসভাবে দাবিয়ে দেওয়া হয়।

বিপ্লবের বছর—১৮৪৮

'পবিত্র মৈত্রীর' তাসের ঘর কিন্তু চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ল ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের ধাক্কায়। এ-বিপ্লব শুরু হয় ফ্রান্সে কিন্তু দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ে অস্ট্রিয়া, রুশিয়া, হাঙ্গেরি, ইটালি—ইউরোপের প্রায় সব দেশেই। ইতিহাসে তাই ১৮৪৮ সালের খ্যাতি 'বিপ্লবের বছর' নামে।

শিল্পবিপ্লবের দরুন ইংল্যাণ্ডের মতো ফ্রান্সেও বড় বড় শিল্প-ব্যবসায়ের সামনে ছোট প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমশ হটে আসছিল আর তার ফলে শহরে মধ্যবিত্তদের মনে ঠাসা হচ্ছিল বিক্ষোভের বারুদ। মজুরদের দুরবস্থাও পৌঁছেছিল চরমে আর কৃষকদের অবস্থা তথৈবচ। ১৮৩০ সালের বিপ্লবেও ভোটের অধিকার না পেয়ে কলকারখানার মালিকেরা পর্যন্ত চটা ছিল এ-রাজত্বের ওপরে। তারা অবশ্য এ-রাজত্বকে একেবারে খতম করতে চায় নি। ভোটাধিকারের দাবি তুলে মধ্যে কিছুটা বিরোধিতা করত এ-ব্যবস্থার।

এর মধ্যে আবার ১৮৪৭ সালে এলো এক ভীষণ আর্থিক সংকট। এ হেন অবস্থায় শিল্পপতিদের ভোটাধিকারের লড়াই দেখতে দেখতে রূপান্তরিত হলো বিপ্লবে। ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্যারিসের রাজপথে মজুর, ছাত্র ও মধ্যবিত্তেরা তিন দিন লড়াই চালিয়ে লুই ফিলিপ্পিকে তাড়াল আর দেশশাসনের জন্তে যে 'অস্থায়ী সরকার'

গঠিত হলো। তাকে বাধ্য করল ফ্রান্সে আবার প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করতে।
তা ছাড়া মজুরেরা এবার শুধু সাধারণ রাজনৈতিক দাবি নয়, কাজ পাওয়ার অধিকার বা ঐ ধরনের নিজস্ব মূল দাবিদাওয়ার কথাও তুলল। তারা এ্যালবার্ট নামে একজন মজুর ও লুই ব্লাঙ্কের মতো তাদের আস্থাভাজন কয়েকজনকে 'অস্থায়ী সরকারে' ঢোকাবার ব্যবস্থাও করল।

ফ্রান্সের ধনিক আর মধ্যবিত্তেরা কিন্তু মজুরদের এত 'বাড়াবাড়ি' মোটেই পছন্দ করছিল না। প্যারিসের বেকার মজুরদের যৎসামান্য কাজের ব্যবস্থা করে তাদের হাতে রাখার জন্যে এরাই গোড়ার দিকে উদ্যোগী হয়ে 'জাতীয় কারখানা' খোলে। গদিতে কিছুটা নিরাপদ হয়ে বসার পর এরাই কিন্তু তাকে 'অপদার্থ পোষার কারখানা' বলে গাল পাড়তে শুরু করল। তারা বললো, এভাবে রাজকোষের কড়ি কোনোমতেই অপব্যয় হতে দেওয়া চলে না, ট্যাকসো না বাড়িয়ে উপায় নেই ইত্যাদি।

শেষ পর্যন্ত ১৮৪৮ সালের জুন মাসে এদের প্ররোচনায় 'অস্থায়ী সরকার' এক কলমের খোঁচায় 'জাতীয় কারখানা' বন্ধ করে এক লক্ষ প্যারিসবাসীর অন্ন কেড়ে নিল। মজুরেরা বাধ্য হয়ে আবার রাজপথে নামল হাতিয়ার হাতে। ২৩শে জুন থেকে তিন দিন তারা প্যারিসের রাস্তায় নির্ভীক লড়াই চালালো। কিন্তু তাদের কোন স্পষ্ট লক্ষ্য বা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ছিল না। লুই ব্লাঙ্কের মতো নেতারা তো আগেই তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। ২৩শে জুনের অভ্যুত্থানের পেছনেও কোন স্পষ্ট পরিকল্পনা ছিল না—অনেকটাই তা ঘটেছিল আচমকাভাবে। তা ছাড়া এ-লড়াইয়ের দুর্বলতা ছিল এই যে, এতে প্যারিসের মজুরেরা সেদিন একাই লড়ল—সমাজের প্রায় অন্য সকলেরই বিরুদ্ধে। এমন কি কৃষকদেরও দলে টানা সম্ভব হয় নি। আর সব থেকে বড় কথা এই-যে, দেশে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা যথেষ্ট অগ্রসর হওয়ার আগে মজুরদের পক্ষে কোনমতেই সম্ভব ছিল না ক্ষমতা দখল।

তাই তিন দিন অসমসাহসিক লড়াইয়ের পর ফরাসী মজুরেরা পরাজিত হলো, বিপুল সৈন্যবাহিনীর আক্রমণের সামনে বিধ্বস্ত হলো তাদের প্রতিরোধ। তারপর ধনিকদের সরকার গুলি করে মারল অসংখ্য মজুরকে, চার হাজারেরও বেশি মজুরকে পাঠাল দ্বীপান্তরে।

এর পর ঐ বছর ডিসেম্বর মাসে ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন নেপোলিয়নের ভাইপো লুই নেপোলিয়ন। এই নির্বাচনের পেছনে ছিল বিশেষ করে ছোট ছোট জমির মালিক ও সৈন্যবাহিনীর সমর্থন। এমনকি ধনিকরাও জবরদস্ত বোনাপার্ট বংশের হাতে শক্তিক্ষমতা সঁপে দিতে রাজি হলো। কারণ নির্বিঘ্নে মুনাফা কামাতে গেলে সবার আগে দরকার দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার।

এই অবস্থায় লুই নেপোলিয়ন বেশ জাঁকিয়ে গদিতে বসে ১৮৫১ সালে 'জাতীয় পরিষদ' ভেঙে দিলেন ও পরের বছরই নিজেকে ঘোষণা করলেন সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন নামে। অত ঘটা করে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও দেশশাসনের নিয়মতন্ত্র গঠনের মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে এত অনায়াসেই এমন একটা অনাসৃষ্টি যে হতে পারল তার কারণ— লুই নেপোলিয়নের এই হঠাৎ ক্ষমতা দখলের পেছনে ছিল মধ্যবিত্ত, বিশেষ করে কৃষকদের সমর্থন।

লুই নেপোলিয়নের রাজত্বে বড় বড় ধনিকদেরই ছিল পোয়া বারো। আর যে কৃষক ও মধ্যবিত্তের ভোটে তিনি গদি পান তাদের প্রতি তিনি করলেন চূড়ান্ত প্রতারণা। আর মজুরদের দাবিয়ে রাখার ব্যাপারে তো তাঁর জুড়ি মেলা ভার।

. সব মিলিয়ে ১৮৪৮ সালের বিপ্লব ফরাসীদেশের পুরোপুরি ধনতান্ত্রিক রূপান্তরের পথে একটা বড় ধাপ।

ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলির কিন্তু ঐ ধরনের রূপান্তরের পথে কতকগুলি মস্ত বাধা ছিল। জার্মানির পক্ষে সব থেকে বড় অন্তরায় ছিল জাতীয় ঐক্যের অভাব। আসলে তখন জার্মানি বলে স্বতন্ত্র কোন দেশ ছিল না—ছিল প্রুশিয়া ও অস্ট্রিয়া এই দুই প্রধান মাতব্বর-সমেত অনেকগুলি ছোট বড় রাজ্য। এদের প্রত্যেকের আপন আপন

রাজা, আলাদা ট্যাকস ও মুদ্রা-ব্যবস্থা, নিজের নিজের ওজন ও মাপের মান, মায় স্বতন্ত্র বৈদেশিক সম্পর্ক পর্যন্ত ছিল।

কাজেই জার্মানিতে পুরোদস্তুর ধনতন্ত্র পত্তনের পক্ষে প্রথমেই প্রয়োজন ছিল এই সব ফিউডাল অব্যবস্থা ও জঞ্জাল হটিয়ে সারা দেশের মধ্যে লেনদেনের জন্যে একটি জাতীয় বাজার প্রতিষ্ঠা। আর তার জন্যে দরকার ছিল সারা দেশে এক ঐক্যবদ্ধ সরকার ও এক পররাষ্ট্রনীতির ব্যবস্থা আর বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যেকার শুল্কপ্রাচীর ভেঙে দিয়ে অবাধে মালপত্র ও মানুষ চলাচলের সমস্ত বাধা অপসারণ।

ফ্রান্সের থেকে তখন জার্মানি ছিল অনেক বেশি কৃষিপ্রধান দেশ। ধনিকেরাও ছিল খুব দুর্বল। দেশের বেশির ভাগ জমিজমা সম্ভ্রান্ত-বংশের বড় বড় জমিদারদের হাতেই ছিল। আর জমিতে যারা চাষ করত তারা ছিল ভূমিদাস। জমিদারদের বিলাসব্যসনের মাশুল জোগাবার জন্যে তাদের জমিতে বেগার খাটতে হতো। পরে নেপোলিয়নের আমলে যখন ঠেকায় পড়ে ভূমিদাস-প্রথা উঠে যেতে থাকল তখনও ভূমিদাসত্ব থেকে 'মুক্তি' কিনে নেবার কড়ি জোগাতে জোগাতে ভূমিদাসদের প্রাণান্ত হলো। ফলে সে 'মুক্তির' মধ্যেও রয়ে গেল বহু দাসত্বের জের।

১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্যারিসে যে-অভ্যুত্থান ঘটে তার ধাক্কায় পরের মাসে বার্লিন ও ভিয়েনাতেও বিপ্লব শুরু হয়। 'পবিত্র মৈত্রী'র পাণ্ডা মেটারনিশ স্বয়ং বিতাড়িত হলেন দেশ থেকে। পরে বিপ্লব অন্যান্য জার্মান রাজ্যগুলিতেও ছড়িয়ে পড়ে। সেখানেও চলে রাস্তায় রাস্তায় মজুর, কারিগর ও মধ্যবিত্তদের 'ব্যারিকেড' লড়াই। কিন্তু ধনিকেরা দুর্বল হওয়ায় প্রায় গোড়ার থেকেই তারা ব্যস্ত ছিল রাজাদের সঙ্গে আপসরফার জন্যে, যদিও বিপ্লবের প্রথম ধাক্কায় হঠাৎ রাজনৈতিক ক্ষমতা তাদেরই হাতে এসে পড়েছিল। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই রাজারা বুঝে নিল ধনিকদের দৌড়। তাই সামান্য কিছু অধিকার দিয়ে তারা অনায়াসে ধনিকদের কিনে নিতে পারল আর তার পরেই সাধারণ মানুষের দাবিদাওয়াকে ডুবিয়ে দিল

রক্তগঙ্গায়। ফ্রান্সের ধনিকেরা জুন মাসের ধাক্কা সামলে ওঠার কিছুদিনের মধ্যেই এখানেও প্রায় মার্চ মাসের আগের অবস্থাই ফিরে এলো।

বিপ্লবী আন্দোলন এইভাবে নষ্ট হওয়ার ফলে জার্মান ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হলো না। সত্যকার জার্মান ঐক্যের জন্য সবার আগে দরকার ছিল প্রুশিয়ার রাজবংশ ও জমিদারগোষ্ঠীর উচ্ছেদ। অষ্ট্রিয়ার ব্যাপার ছিল আরো গোলামেলে। সেখানে ফিউডাল অব্যবস্থার জঞ্জাল হটানো ছাড়াও মস্ত সমস্যা ছিল অষ্ট্রিয়ার অধীন হাঙ্গেরিয়ান, ইটালিয়ান, চেক, পোল বা ঐ ধরনের জাতির সমস্যা। ফরাসী বিপ্লবের 'সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা'র বাণী এই সব জাতির মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে। তারপরে নেপোলিয়নের কড়া শাসন সে-কামনাকে আরো প্রবল করে তোলে। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের ডাকে এ-সব জাতির মধ্যে বিপুল সাড়া জাগে। এমনকি ইতালিতে গ্যারিবল্ডি ও মাৎসিনি আর হাঙ্গেরিতে কসুথ্-এর মতো দেশপ্রেমিক নেতাদের কিছুদিনের জন্যে স্বাধীন সরকারও গঠিত হয়। তারপর কিন্তু অষ্ট্রিয়ার সম্রাট সাধারণভাবে ধনিকদের সাহায্যে এই ধাক্কা সামলে ওঠেন। তারপরেই তিনি শুরু করেন নানা প্যাঁচ কষে এই জাতিগুলিকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিতে—একের সাহায্যে অপরের বিদ্রোহ দমন করতে।

তাই ১৮৪৮-এর বিপ্লবে না জার্মান ঐক্যের সমস্যা, না হাঙ্গেরিয়ান, ইটালিয়ান, চেক, পোলদের স্বাধীনতার সমস্যা—কোনটারই শেষ পর্যন্ত কোন সমাধান হলো না। এর প্রধান কারণ হলো দুর্বল জার্মান ধনিকশ্রেণীর চূড়ান্ত কাপুরুষতা।

তবু এই বিপ্লবের ফলে অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের মধ্যে ভূমিদাস-প্রথা খতম হয়। কৃষকেরা জমি ছেড়ে অন্যত্র যাবার বা জমি কেনাবেচা করার অধিকার পায়। তা ছাড়া বিপ্লবের ফলে সুইজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, সার্ডিনিয়া, এমন কি প্রুশিয়াতেও অল্পবিস্তর

নিয়মতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয়। অর্থাৎ, ইংল্যাণ্ড বা ফ্রান্সের মতো পুরোদস্তুর ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথের বেশ কিছু বাধা দূর হয়।

১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব আর ১৮৪৮ সালের এই ইউরোপ-জোড়া বিপ্লবের মধ্যে একটা গরমিল খুবই চোখে পড়ার মতো : ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে নিজস্ব বিশেষ ভূমিকা ছিল মজুরদের।

কিন্তু সঠিক পথের নিশানা তখনও তারা পায় নি। তাই অন্ধ আক্রোশে কখনও তারা লাড্ডাইটদের মতো যন্ত্রপাতি ভেঙেছে, কখনও চার্টিস্টদের মতো সরলভাবে বিশ্বাস করেছে যে সর্বজনীন ভোটাধিকারই বুঝি তাদের সমস্ত দুঃখ দূর করবে, কখনও বা প্যারিসের বিপ্লবী মজুরদের মতো সমস্ত সমাজের বিরুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে একক সংগ্রামে।

সঠিক পথের নির্দেশ দিলেন কার্ল মার্কস আর ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস্। তাঁরা বললেন, মানুষের সঙ্গে মানুষের আর শোষক-শোষিতের সম্পর্ক থাকবে না। সব মানুষ সমান হবে।

কিন্তু এঁদের আগে কি সমাজের সমস্ত দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করে সাম্যের, অর্থাৎ সব মানুষকে সমান করার কল্পনা কেউ করেন নি?

নিশ্চয়ই করেছিলেন। শুধু তাই নয়, উনিশ শতকে চার্লস ফুরিয়ের, সেণ্ট সাইমন ও রবার্ট ওয়েন (এঁদের মধ্যে প্রথম দু-জন ফরাসী ও তৃতীয় জন ইংরেজ) ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার যে তীক্ষ্ণ ও হৃদয়াবেগপূর্ণ সমালোচনা করেন তা সত্যই আশ্চর্য। তাঁরা স্বপ্ন দেখেছিলেন—চলতি সমাজব্যবস্থার শোষণ ও অত্যাচারের জায়গায় সত্য ও ন্যায়ের ওপরে প্রতিষ্ঠিত এক সুন্দর সমাজের।

এ ছাড়াও ছিলেন আর এক ধরনের মানুষ। ধনতান্ত্রিক সমাজের গলদ কোথায় তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার দিক থেকে হয়তো তাঁরা ওয়েন, সেণ্ট সাইমন বা ফুরিয়ের-এর সমকক্ষ ছিলেন না। কিন্তু ধনিকেরা শোষণ-অত্যাচার ভুলে মজুরদের কল্যাণ করতে বসবে এমন কোনো মোহ তাঁদের ছিল না। তাই তাঁরা সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হয়ে ধনতান্ত্রিক সমাজের

বিরুদ্ধে বারবার গোপন ষড়যন্ত্র করেছেন, নির্ভীকভাবে হাতিয়ার ধরেছেন,—কেউ কেউ হয়তো তার জন্যে চরম মূল্যও দিয়েছেন অকাতরে। এই রকম এক বিপ্লবী ছিলেন বাব্যুফ্—১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবের সময়েই যিনি বুঝেছিলেন 'সাম্য ছাড়া—অর্থাৎ যত-দিন ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে ততদিন—স্বাধীনতা অসম্ভব'। তাই গোপন "সাম্য সমিতি" গড়ে তিনি ষড়যন্ত্র করেছিলেন বিদ্রোহের, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপের। সে-ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে। তাঁর ও তাঁর সহকর্মী ডার্থে-র মৃত্যুদণ্ড হয়।

এমনই আর এক বিপ্লবী ছিলেন ব্লাকি। তাঁর জীবনের ছত্রিশ বছর কেটেছিল জেলে জেলে। বিপ্লব ছাড়া সাম্য প্রতিষ্ঠা অসম্ভব—এই অলন্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে বারবার তিনি গুপ্তসমিতি গড়ে ষড়যন্ত্র করেছেন বিদ্রোহের আর ব্যর্থতার মাশুলও দিয়েছেন অকাতরে। তাঁরও ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। কিন্তু জগদ্বিখ্যাত ফরাসী লেখক ভিক্টোর হুগোর আবেদনের ফলে সে-দণ্ড কার্যকরী হয় নি শেষ অবধি।

এই দুই ধরনের মানুষের সঙ্গেই কিন্তু মার্কস ও এঙ্গেলসের ছিল মস্ত গরমিল। রবার্ট ওয়েন, সেণ্ট সাইমন ও ফুরিয়ের বর্তমান সমাজের সমস্ত গলদগুলি বাদ দিয়ে কল্পনায় সাম্যের এক মানসম্বর্গ গড়ে তোলেন। তাঁদের ধারণা ছিল যে, তাঁদের সাম্যচিন্তায় সকলকে দীক্ষিত করে, বিশেষ করে প্রচার মারফত ধনিকদের মন গলিয়ে, সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মজুরদের যে একটা বিশেষ ভূমিকা আছে তা তাঁরা দেখেন নি। তাই তাঁরা দরকার মনে করেন নি মজুরদের ট্রেড ইউনিয়ন বা রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে কোনো যোগ রাখার। এই কল্পনা-বিলাসের দরুনই তাঁরা বা তাঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত অন্যেরা যে-সব 'সাম্যবাদী উপনিবেশ' গড়েছিলেন কিছুদিনের মধ্যেই সেগুলি নষ্ট হয়ে যায়। আর ধনিকদেরও মন গলবার কোনো লক্ষণই দেখা যায় নি।

অন্যদিকে বাব্যুফ্ বা ব্লাকি গোছের বিপ্লবীদের ছোট ছোট

গুপ্তসমিতি গড়ে ষড়যন্ত্র ও অভ্যুত্থান মারফত ক্ষমতা দখলের যে-চেষ্টা করতেন তার মধ্যেও বিশেষ কোনো ভূমিকা ছিল না মজুরদের। যুদ্ধের মতো বিপ্লবেরও কৌশল আছে, শুধু সাহস, আন্তরিকতা বা বা হৃদয়াবেগ দিয়েই বিপ্লব ঘটানো যায় না। তাই তাঁদের অসম-সাহসী বিপ্লবপ্রচেষ্টা সেদিন ব্যর্থ হলো একের পর এক।

মার্কস্ ও এঙ্গেলস্ দেখালেন, সমাজতন্ত্রের কথা আর কবির কল্পনা হয়ে থাকবে না। তার বদলে হয়ে দাঁড়াবে বিজ্ঞান। তাঁরা দেখালেন, মানুষের সমাজ চিরদিন এক রকমের থাকে না—তার অদলবদল হয়। সেই অদলবদল খামোখা বা আচমকা ঘটে না। মানুষের বাঁচার জন্যে যে-সব জিনিসপত্র লাগে তা তৈরি করার রীতি বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে সমাজও বদলায়। এই বদল নির্বিঘ্নে, বিনা সংঘাতে হয় না। সমাজের মধ্যে যে নানা শ্রেণী থাকে তাদের মধ্যে লড়াইয়ের ভেতর দিয়েই হয়। এই সংঘাতের পথেই পরের পর আদিম সাম্যবাদী, দাস ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজের পর আমরা এখন পৌঁছেছি ধনতান্ত্রিক সমাজে। কিন্তু সমাজের অদল-বদলের যে-নিয়ম আমরা দেখলাম, তারই ফলে এ-সমাজও চিরদিন টিকবে না। তার জায়গায় আসবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ। এই রূপান্তর হবে ধনতান্ত্রিক সমাজের দুটি প্রধান শ্রেণীর—ধনিক ও মজুরের—লড়াইয়ের ভেতর দিয়েই। আসলে মজুর শ্রেণীই ঘটাবে এই রূপান্তর। কাজেই সাম্যবাদীদের কাজ হচ্ছে মজুরশ্রেণীকে সংঘবদ্ধ করা ও রাজনৈতিক চেতনা পেতে সাহায্য করা। ধনতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরের কাজে দুনিয়ার সমস্ত মজুরের স্বার্থ এক।

তাই মার্কস ও এঙ্গেলস ডাক দিলেন ; 'দুনিয়ার মজুর এক হও'।

বিভিন্ন দেশের মজুর আন্দোলনকে একসূত্রে গেঁথে মূল লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাবার জন্যে পরে তাঁরাই উদ্যোগী হয়ে 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ' প্রতিষ্ঠা করেন। অর্থাৎ শুধু সাম্যবাদী চিন্তা নয়, মজুর আন্দোলন গড়ে তোলার দিক থেকেও মার্কস ও এঙ্গেলসই হলেন অগ্রণী।

'ভূগোলের নাম' থেকে জাতীয় রাষ্ট্র

১৮৪৮ সালের বিপ্লবের জোয়ার থিতিয়ে আসার পর পশ্চিম ইউরোপে কিছুদিনের মতো রাজনৈতিক তৎপরতার স্রোতে ভাঁটা পড়ে। আবার ধনতন্ত্র ছড়িয়ে পড়ার পথে যে-সব বাধা ছিল বিপ্লবের ঢেউয়ে তা বেশ কিছুটা ভেসে যাওয়ায় ১৮৫০ সালের পর ফ্রান্স ও জার্মানির মতো দেশে কলকারখানা বেশ দ্রুত বেড়ে উঠতে থাকে। ব্রিটেন এদিক দিয়ে সব থেকে এগিয়ে ছিল। কিন্তু অন্যান্য দেশও এবার আর বাদ পড়ে নি। শুধু পশ্চিম ইউরোপ নয়, রাশিয়া বা আমেরিকাতেও এর ধাক্কা পৌঁছায়।

পশ্চিম ইউরোপে কিন্তু ধনতন্ত্র প্রসারের পথে মস্ত বড় বাধা ছিল জার্মানি ও ইটালির ছত্রভঙ্গ অবস্থা।

তবু সমস্ত বাধা সত্ত্বেও জার্মানি ও ইটালির রাজ্যগুলিতেও ক্রমেই কলকারখানা গড়ে উঠতে থাকে। তার ফলে দুই জায়গাতেই ছত্রভঙ্গ অবস্থা দূর করে ব্যাপক জাতীয় বাজার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন বেশি বেশি অনুভব করা যেতে থাকে। বাস্তব অবস্থার অদল-বদলের এই তাগিদের ফলেই ১৮৬১ সালে ইটালিতে আর ১৮৬৬ সাল নাগাদ জার্মানিতে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দেখা দেয় জার্মান ও ইটালিয়ান জাতীয় রাষ্ট্র।

গোটা সমাজের ধনতান্ত্রিক রূপান্তরের মাপকাঠিতে পুরানো ব্যবস্থায় তুলনায় এই জাতীয় ঐক্য নিশ্চয়ই মস্ত বড় অগ্রগতি। একে তাই জাতীয় বিপ্লবও বলা চলে। কিন্তু ইটালিতে বিখ্যাত দেশপ্রেমিক গ্যারিবল্ডির 'লাল কুর্তা' আন্দোলন ছাড়া এই জাতীয় বিপ্লব দুটিতে জনসাধারণের নিজস্ব প্রত্যক্ষ ভূমিকা তেমন কিছু ছিল না। ইটালির ক্ষেত্রে সার্ডিনিয়ার রাজা দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েল ও তাঁর বিচক্ষণ মন্ত্রী কাভুর আর জার্মানির বেলায় প্রুশিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়াম ও তাঁর দুর্ধর্ষ মন্ত্রী বিসমার্ক নানা প্যাঁচ কষে ও যুদ্ধ বাধিয়ে ইটালিয়ান ও জার্মান রাজ্যগুলির ওপর থেকে অস্ট্রিয়ার আধিপত্য নষ্ট করেন আর গড়ে তোলেন ইটালিয়ান ও জার্মান ঐক্য।

কিন্তু প্রধানত রাজা আর মন্ত্রীর চেষ্টায় এইভাবে ওপর থেকে ঐক্য গড়ে উঠল বলে দুই দেশেরই, বিশেষ করে জার্মানির, রাষ্ট্রব্যবস্থা অনেকটাই সেকেলে রয়ে গেল। বিসমার্কের উদ্যোগে সম্ভ্রান্ত জমিদারগোষ্ঠী ও ধনিকদের মধ্যে সেদিন যে আপস-রফা হলো তার মধ্যেই গাঁথা হলো জার্মান সাম্রাজ্যের ভিত।

এইভাবে ইউরোপের সব দেশেই অল্পবিস্তর ধনতন্ত্রের ছোঁয়াচ লাগল আর তার ফলে সমাজে বেশ বড় রকমের অদলবদল দেখা গেল। এমনকি যে-রাশিয়া একচ্ছত্র জারের শাসনে সব রকম পরিবর্তনকে এতদিন রুখে আসছিল সেও বাদ পড়ল না। আঠারো শতকের গোড়ার দিকে অবশ্য 'পিটার দি গ্রেট' সেখানে পশ্চিম ইউরোপের মতো অবাধ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন আর তারই জন্যে জোরালো কেন্দ্রীয় সরকার ও ধনতান্ত্রিক যুগের উপযোগী উন্নত ভাবনাচিন্তা চালু করার ব্যাপারে উদ্যোগী হন। কিন্তু ভূমিদাস-প্রথা হাজারো কুসংস্কার ও বিধিনিষেধসমেত রাশিয়ায় এমন গেড়ে বসেছিল যে তাঁর চেষ্টা তখন সফল হতে পারে নি।

কিন্তু সমাজের খুব বড় রকম অদলবদল যে আর না হলেই নয়—আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে ভূমিদাসেরা যেভাবে অসহ্য দুরবস্থার বিরুদ্ধে বারবার বিদ্রোহ করতে থাকে তার থেকেই স্পষ্ট বোঝা যেতে থাকে। প্রচণ্ড অত্যাচার চালিয়েই সেদিন দমন করা হয় ঐ বিদ্রোহ।

একদিকে সমস্ত উন্নতির পথ-রোধ-করা ভূমিদাস-প্রথা, আর অন্যদিকে তারই বনেদের ওপর প্রতিষ্ঠিত জারের একচ্ছত্র খামখেয়ালি শাসন, বহুদিন রাশিয়াকে সব রকম পরিবর্তনের ছোঁয়াচ থেকে বাঁচিয়ে রাখে। শুধু তাই নয়,—নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর কোনো দেশেই যাতে 'শান্তিভঙ্গ', অর্থাৎ ওলটপালট না হয় তার খবরদারির জন্যে রাশিয়াই হয়ে দাঁড়ায় ইউরোপের পাহারাওয়ালা। ১৮৪৮ সালে বিভিন্ন দেশের বিপ্লব দমনে সরাসরি সাহায্য করে জারের সৈন্যবাহিনী।

জারের স্বেচ্ছাচারী শাসন ও ভূমিদাস-প্রথা যে সমস্ত উন্নতির অন্তরায় সে-কথা রাশিয়ার প্রায় সব লোকই বুঝতে শুরু করে অল্পবিস্তর। এমন কি বনেদী ঘরের কিছু লোকও এ সত্য উপলব্ধি ক'রে ১৮২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে জারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। উদ্দেশ্য ছিল জারের খামখেয়ালি শাসন বন্ধ করে এমন ব্যবস্থা চালু করা যেখানে জারকেও মানতে হবে দেশের আইনকানুন। তা ছাড়া, ভূমিদাস-প্রথার উচ্ছেদও তাঁরা চেয়েছিলেন। কিন্তু সে-ষড়যন্ত্র সেদিন ধরা পড়ে, আর তাঁদের অনেককেই প্রাণ দিতে হয় ফাঁসিকাঠে।

তবু সমাজ-পরিবর্তনের নিয়মকে শেষ পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখা যায় নি। ১৮৫৩-৫৬ সালে ক্রাইমিয়া যুদ্ধে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও তুর্কির হাতে পরাজয়ের পর জারতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার বুঝতে পারেন যে জনসাধারণের দুঃখদুর্দশা ও অসন্তোষ এমন জায়গায় পৌঁছেছে, যার ফলে যে-কোনো দিন ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটে যেতে পারে। "ভূমিদাস-প্রথা নিচের থেকে উচ্ছেদ হতে শুরু করার আগেই ওপর থেকে তা উচ্ছেদ করা ভালো"—এই হিসেব কষে ১৮৬১ সালে তিনি ভূমিদাস-প্রথার অবসান ঘোষণা করেন ভূমিদাসদের কাছ থেকে অবশ্য এই মুক্তির মূল্য বাবদ আদায় করা হয়েছিল ২০০ কোটি স্বর্ণ-রুবল। কাজেই তাদের ওপরে শোষণের বোঝা এর ফলে বাড়ল বই কমল না। তবু ভূমিদাস-প্রথা উচ্ছেদের ফলে রাশিয়ায় ধনতন্ত্র প্রসারের পথে সব থেকে বড় বাধা অপসারিত হলো।

গৃহযুদ্ধ, না বিপ্লব ?

শুধু ইউরোপেই নয়, শিল্পবিপ্লব মার্কিন মুল্লুকেও প্রভাব বিস্তার করে। ১৮০০ সালের পর থেকেই সেখানে শুরু হয় কলকারখানার পত্তন। ১৮৩০-এর পর তা জোর কদমে এগোতে থাকে। শিল্পোন্নতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চারিদিকে তেলের খনি ও ব্যাঙ্ক গজিয়ে

উঠতে থাকে। ১৮৬০ সাল নাগাদ শিল্পের দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থান দাঁড়ায় চতুর্থ। স্বভাবতই কলকারখানার মালিকদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খুবই বেড়ে ওঠে সমাজে।

দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে কিন্তু অবস্থা ছিল অন্যরকম। সেখানে মার্কিন দাসমালিকেরা হাজার হাজার নিগ্রো ক্রীতদাসকে পশুর মতো খাটিয়ে তুলো ও অন্যান্য শস্যের আবাদ করাতো আর মুনাফা কামাতো কোটি কোটি টাকা। আসলে এ-অঞ্চলের একচ্ছত্র প্রভু ছিল এই দাসমালিকের দল। উত্তর অঞ্চলের কলকারখানার মালিকদের সঙ্গে এদের বনিবনা হতো না। কারণ দাসদের দিয়ে এই ভাবে আবাদ করার প্রথা কারখানা-মালিকদের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ মজুর পাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, বিশেষ করে দক্ষিণ অঞ্চলে কলকারখানা বাড়িয়ে তোলার পথ প্রায় রুদ্ধ করে রেখেছিল অনেকটাই।

ওর ওপরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরাট পশ্চিম এলাকায় যখন বসবাস শুরু হলো তখন তার দখলদারি নিয়ে দু-পক্ষের ঝগড়া চরমে পৌঁছল। দু-পক্ষই চাইল দেশের সরকারকে পুরোপুরি নিজের মুঠোর মধ্যে আনতে। এমন একটা অবস্থা দাঁড়াল যে শিল্পোন্নতির জন্য দরকার পড়ল দাসমালিকদের ক্ষমতা খাটো করার। তাই দাবি উঠল দাস-প্রথা উচ্ছেদের। সারা দুনিয়া জুড়ে কিছু কিছু মানবহিতৈষী দাস-প্রথার বিরুদ্ধে ঐ সময়ে যে তীব্র আন্দোলন চালাচ্ছিলেন তাও জোরদার করল এই দাবিকে।

১৯৬০ সালে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী হিসাবে অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হলেন। এ-নির্বাচনে তাঁর পেছনে ছিল দাস-প্রথা-বিরোধী শক্তিগুলি। দাসমালিকেরা কিন্তু নির্বাচনে ঘা খেয়ে চুপ করে রইল না। তাদের নেতৃত্বে দক্ষিণের রাজ্যগুলি একে একে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সরে পড়তে থাকে আর ১৮৬১ সালে নিজেদের এক পাল্টা সরকার গঠন করে বিদ্রোহ করে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। সূত্রপাত হয় ঘরোয়া যুদ্ধের।

এ-যুদ্ধে চললো একদিকে দাসমালিকদের মতো সমাজের সব থেকে পেছিয়ে-পড়া শক্তি, আর অন্যদিকে কলকারখানার মালিক, কৃষক, মজুর, মধ্যবিত্ত ও নিগ্রোদের এক শক্ত জোট—এই দুই পক্ষের মধ্যে। যুদ্ধ চালাতে চালাতেই ১৮৬২ সালে লিঙ্কন দাসপ্রথার উচ্ছেদ ঘোষণা করেন। তার ফলে মুক্তি পায় ৪০ লক্ষ নিগ্রো ক্রীতদাস। এদের অনেকেই গৃহযুদ্ধে নির্ভীকভাবে লড়াই করেছিল। ১৮৬৫ সালে দাসমালিকেরা অবশেষে হার মানে। দুর্ভাগ্যক্রমে তার পাঁচ দিনের মধ্যেই দাসমালিকদের এক ভাড়াটে গুণ্ডার হাতে নিহত হন লিঙ্কন।

গৃহযুদ্ধে দাস-প্রভুদের পরাজয়ের ফলে মার্কিন দেশে ধনতন্ত্র প্রসারের পথে আর কোনো বাধা রইল না। এর পর খুব দ্রুতগতিতে সেখানে কলকারখানার পত্তন হতে থাকে। সমাজের পেছিয়ে-পড়া শক্তিকে হটিয়ে এইভাবে উন্নততর সমাজ-ব্যবস্থা চালু করার সড়ক পরিষ্কার করেছিল বলে একে শুধু একটা মামুলি গৃহযুদ্ধ বলা চলে না। আসলে এর ভেতর দিয়ে ঘটল ধনতান্ত্রিক বিপ্লব।

কিন্তু সত্যাই কি মুক্তি পেল নিগ্রোরা? দাসমালিকদের বড় বড় আবাদের জমি কেড়ে তাদের হাতে তুলে দিতে পারলে তবেই তা সম্ভব হতো। কিন্তু তেমন কোনো মতলব মার্কিন ধনিকদের ছিল না। দেশের সরকারকে পুরোপুরি আপন মুঠোয় এনে, কলকারখানা বাড়িয়ে তোলার সমস্ত বাধা দূর করে তারা নিগ্রোদের ফের ছেড়ে দিল দাসমালিকদের দয়ার ওপরে। তাই যে মুক্তি নিগ্রোরা সেদিন পেল তা খুবই আংশিক। অনেক সময়েই দেখা গেল যে, আগের চাইতে তাদের দুরবস্থা বেড়েছে বই কমে নি।

এদিকে এশিয়ায়

ধনতন্ত্রের দিগ্বিজয় শুধু ইউরোপ বা আমেরিকাতেই থেমে রইল না। সুদূর এশিয়া, আফিকা ও অস্ট্রেলিয়াতেও ক্রমে পৌছলো তার ঢেউ। এইখানেই কিন্তু অনেক কথা এসে পড়ে।

এশিয়ার কথাটাই ধরা যাক। চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া বা এশিয়ার আরো কিছু দেশের সঙ্গে ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ দিনেমারদের বাণিজ্য চলছিল বহুদিন থেকেই। গোড়ায় গোড়ায় সে বাণিজ্য ছিল হুটো সমান সমান দেশের মধ্যে লেনদেন। কিন্তু সমাজব্যবস্থার দিক থেকে ইউরোপের দেশগুলি যতই ধনতন্ত্রের দিকে এগোতে লাগল ততই তাদের সঙ্গে এশিয়ার দেশগুলির ঘটতে থাকল মস্ত ব্যবধান। কারণ এশিয়ার সব দেশেই তখন চালু ছিল মান্ধাতার আমলের এক সেকেলে সমাজব্যবস্থা। একদিকে এই দুর্বলতার সুযোগে আর অন্যদিকে নিজেদের উন্নততর সমাজব্যবস্থার জোরে ইউরোপের দেশগুলি এশিয়ার ওপরে সরাসরি লুটপাট বা বাণিজ্যের নামে বাটপাড়ি চালাতে শুরু করল। ক্রমে নানা ছুতোয় দুর্বল দেশগুলিকে কবলে এনে বিদেশী সওদাগরী প্রতিষ্ঠানগুলিই হয়ে দাঁড়ায় দেশের আসল মালিক।

এই লুট-বাটপাড়ির কড়িতেই সেদিন অনেকখানি গড়ে ওঠে ইংল্যাণ্ডের মতো দেশের কলকারখানা। নইলে গোড়ায় গোড়ায় কলকারখানা পত্তন করতে গেলে যে মোটা রকম পুঁজি লাগে তা জোটানো খুবই শক্ত হতো। এই সব কলকারখানায় যে রাশি রাশি মাল তৈরি হতে লাগল তার জন্যে আবার দরকার পড়ল ভারত বা চীনের মতো মস্ত বাজার। তাই ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মতো একটি সওদাগরী প্রতিষ্ঠান যে এ-সব দেশের বাজারের ওপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব করবে এটা বিলেতের কলমালিকদের পছন্দ হচ্ছিল না। আমরা দেখেছি, ১৮৩২ সালে ভোটাধিকার সংস্কার বিল পাশ হওয়ার পর ইংল্যাণ্ডে এরাই সব থেকে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। তারই জোরে এরা ক্রমাগত ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারকে খাটো করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর কোম্পানির হাত থেকে ভারতশাসনের ভার ইংল্যাণ্ডের রানী নিজের হাতে তুলে নেন। অর্থাৎ, যে-ব্রিটিশ সরকারের ওপরে তখন বিলেতের কলমালিকদের কর্তৃত্ব সব থেকে

বেশি জোরদার হয়ে উঠেছিল, সেই সরকারই সরাসরি ভারতশাসনের ভার নিল। ভারতবর্ষ হয়ে দাঁড়াল ইংল্যাণ্ডের গোলাম দেশ।

উনিশ-বিশ মাত্রায় এই ব্যাপারই ঘটে এশিয়ার অন্য দেশগুলিতেও। তবে চীনের মতো কোনো কোনো জায়গায় হয়তো বিভিন্ন বিদেশী দস্যুদের টানাটানিতে গোটা দেশটা কোনো একটা ইউরোপীয় দেশের কবলে চলে যেতে পারে নি—তার নানা অঞ্চলে দেখা গেল ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, মার্কিনদের প্রভুত্ব বা প্রভাব।

ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজদের মারফত নতুন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা এসে এশিয়ার দেশগুলিতে বিরাট ওলটপালট ঘটায়। বহু সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ও অনেক রক্তাক্ত যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যেও এ-সব দেশের সমাজ হাজার হাজার বছর ধরে মোটের ওপরে এক রকম অবস্থাতেই ছিল। অচল অনড় সমাজের মূল কথা ছিল কৃষি ও কুটিরশিল্পের ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম—স্বয়ংসম্পূর্ণ, কেননা গ্রামবাসীর খাওয়াপরার জিনিসপত্র গ্রামেই তৈরি হতো, তার জন্যে বাইরের সঙ্গে লেনদেনের বড় একটা দরকার হতো না। গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রত্যেকের কাজকর্মই সাব্যস্ত করা ছিল বহুদিনের রীতিনীতি ও বিধিনিষেধের দ্বারা।

এই সমাজব্যবস্থাই ভেঙে পড়তে থাকে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার সংস্পর্শে এসে। গোড়ার দিকের খোলাখুলি বা প্রচ্ছন্ন লুটপাটের থেকেও মারাত্মক হলো এ-সব দেশে বিলিতী কলকারখানার মাল আমদানি। ১৮২৪ সালে ভারতবর্ষে বিলিতী কাপড় আসত ৬০ লক্ষ গজ। ১৩ বছরের মধ্যে ঐ আমদানি দাঁড়াল ৬ কোটি ৪০ লক্ষ গজে। আর অন্যদিকে ঐ সময়ের মধ্যেই জগদ্বিখ্যাত মসলিনের কেন্দ্র ঢাকা শহরের জনসংখ্যা দেড় লক্ষ থেকে নেমে এলো বিশ হাজারে। এমনটা ঘটল কিন্তু দুই দেশের মধ্যে স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে নয়—মালিকদেশ তার রাজনৈতিক আধিপত্য খাটিয়ে গোলাম দেশের ওপরে এক অসমান লেনদেন চাপিয়ে দিতে পারল বলেই। যাই হোক, এর ফলাফল কী দাঁড়াল আন্দাজ করা মোটেই

শক্ত নয়—কোটি কোটি কৃষক ও কারিগরের অসহ্য দুর্গতি, দুর্ভিক্ষ, অনাহার আর অপমৃত্যু ঘটে গেল। এই সঙ্গে একটি কথা কিন্তু মনে রাখা দরকার। যে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্য-সমাজ জাতিভেদ, কুসংস্কার, নানা অর্থহীন আচার ও বিধিনিষেধের শিকলে বহুদিন থেকেই মানুষকে অনবরত পীড়ন করে আসছিল, স্বয়ংসম্পূর্ণতার পাঁচিল তুলে আটকে রেখেছিল সমস্ত উন্নতির পথ, এবার তা ভেঙে পড়তে লাগল। ঐ সমাজব্যবস্থায় গ্রাম্য মাতব্বরদের নানা অত্যাচার ছাড়াও ছোট বড় অসংখ্য স্বেচ্ছাচারী রাজা-বাদশা-নবাব-মনসবদার-সুবেদারদের অফুরন্ত খাঁই মেটাতে কৃষক ও কারিগরদের প্রাণান্ত হতো। তাই ঐ সনাতন ব্যবস্থার জঞ্জাল না হটিয়ে শেষ পর্যন্ত দেশের কোনো স্থায়ী বড় রকমের উন্নতি সম্ভব ছিল না।

কিন্তু সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পার হয়ে বিদেশীরা কি এই উন্নতি ঘটাবার জন্যেই এশিয়া বা আফ্রিকায় ধ্বংস বয়ে আনে? একশো বার —না। তারা যে ঠগজোচ্চুরি,ডাকাতি,রাহাজানি করে দুহাতে লুঠতেই এসেছিল এদেশে -- এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না।

ইউরোপে সেকেলে সমাজের জঞ্জাল হটিয়ে দেশের ধনতান্ত্রিক রূপান্তর ঘটিয়েছিল সেখানকারই লোক। এশিয়ায় ধনতন্ত্রের বিদেশী বাহক বনেদী সমাজকে প্রচণ্ড ঘা মারল। কিন্তু তার জায়গায় নতুন ধনতান্ত্রিক সমাজ পত্তন করায় তার কোনো স্বার্থই ছিল না। ভাঙচুর হলো কিন্তু নতুন কিছু গড়ে উঠল না—এই হলো এশিয়ার বিড়ম্বনা।

তবু নতুন উন্নততর সমাজব্যবস্থার বাহন হিসেবে তারা যখন এক-দিকে এ দেশের বনেদী সমাজকে চুরমার করল,আর অন্যদিকে এদেশের মাল লুটবার জন্যে, এখানকার বাজারের মাল কাটাবার ও সস্তায় মজুর খাটিয়ে মুনাফা কামাবার জন্যে রেল-টেলিগ্রাফের জরুরী ব্যবস্থা করল, বা সামান্য কিছু যন্ত্রপাতি আমদানি করল তখন না চাইলেও তারা এ দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ নিশ্চয়ই কিছুটা পরিষ্কার করল, এমন কি কিছুটা মালমশলাও যোগাল সে-উন্নতির।

সবার ওপরে যে-কথাটি কিন্তু পরিষ্কার বোঝা দরকার সেটি এই যে, সে-উন্নতি বিদেশীর কৃপায় ঘটবে না—সেটি ঘটাতে হবে এশিয়ার মানুষকেই।

এশিয়ার মানুষ কোনোদিনই কিন্তু বিদেশী শোষণ বা জুলুম মুখ বুঁজে সহ্য করে নি। বারবার তারা অসীম সাহসে লড়াই করেছে তার বিরুদ্ধে।

চীনের কথাই ধরা যাক। ১৮৪০ সালে চীনাদের জোর করে আফিম গেলাবার 'মহান' উদ্দেশ্য নিয়ে ইংরেজরা চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। দুর্বল চীনকে তারা সেদিন বাধ্য করে অপমানজনক এক দাসখতে সই দিতে। তারপর একে একে ফরাসী, রুশ, জার্মান, মার্কিন ও জাপানী শকুনেরা চীনের জ্যান্ত দেহটাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খেতে থাকে। তার সঙ্গে যোগ দেয় চীনের রাজবংশ, জমিদার, জাঁদরেল ডাকাতসর্দার ও বিদেশীদের ফড়ে দালালের দল।

এই সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে চীনের কৃষক ও সাধারণ মানুষ উনিশ শতক জুড়ে বহুবার বিদ্রোহ করে। তার মধ্যে সব থেকে নামকরা হলো তাইপিং বিদ্রোহ। ১৮৫১ সাল থেকে একটানা তেরো বছর এ-বিদ্রোহ চলে। এমনকি কিছুদিনের মতো মস্ত এলাকা জুড়ে স্বাধীন তাইপিং রাজ্যও প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু দেশী-বিদেশী অত্যাচারী-দের যুক্ত আক্রমণে শেষ পর্যন্ত বিধ্বস্ত হয় ঐ বিদ্রোহ।

ভারতবর্ষেও বিদেশী জুলুমের বিরুদ্ধে বার বার বিদ্রোহ দেখা দেয়। তার মধ্যে সব থেকে নামকরা কয়েকটি হলো সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ, পাইক ও চুয়াড় বিদ্রোহ, কোল ও সাঁওতাল বিদ্রোহ, অসংখ্য মোপলা বিদ্রোহ, ফৈরাজী, ওয়াহবি ও নীল আন্দোলন, আহমদনগর, পুনা ও দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য বিদ্রোহ।

এগুলি প্রধানত সর্বস্ব-খোয়ানো কৃষক, কারিগর ও আদিবাসীদের বিদ্রোহ। দেশের এক-এক কোণে ছোট বড় অঞ্চল জুড়ে এগুলি ক্রমাগত চলে। এরই পাশাপাশি আবার লক্ষ্য করা যায় ভারতীয়

সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ, এমনকি বিদ্রোহের চেষ্টাও। কারণ সিপাহীরা তো আসলে সামরিক উর্দী-পরা কৃষকই।

ঐ অসন্তোষই বাড়তে বাড়তে পরিণত হয় ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে। দেশের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এ-বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহীরা প্রভুত্ব বিস্তার করে প্রায় এক লক্ষ বর্গ মাইল জায়গা জুড়ে। অযোধ্যা, রোহিলখণ্ডের মতো কোনো কোনো অঞ্চলে সমস্ত গ্রামবাসী সিপাহীদের পাশে দাঁড়ায়। বিদ্রোহ সেখানে পরিণত হয় গণঅভ্যুত্থানে।

বিদ্রোহী সিপাহীরা অধিকাংশই ছিল কৃষক, কারিগর বা গ্রামের গরিব মানুষ। বিদেশীদের কৃপায় আপন জীবিকা খুইয়ে এরা ভেতরে ভেতরে ভয়ঙ্কর আক্রোশে ফুঁসছিল। তার ওপরে সাহেব অফিসারদের দুর্ব্যবহার ও অপমান বারুদে আগুন জোগাল। তাইপিং বিদ্রোহে কৃষকেরা যেমন নিজেরা কৃষক সমিতি গড়ে বিদ্রোহ চালায়, এখানেও সেই রকম সাধারণ সিপাহীরা লড়াই করতে থাকে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে। কিন্তু বিদ্রোহ কোন পথে চলবে, তার লক্ষ্য কি হবে—এ সব সম্পর্কে তাদের কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। ফলে এ-বিদ্রোহে নেতৃত্ব করেছেন ঝাঁসির রানী, নানা সাহেব, তাঁতিয়া তোপি, অযোধ্যার নবাব বা ফয়জাবাদের মৌলবীর মতো রাজারাজড়া-নবাব-মৌলবীরা। এইসব বনেদী ঘরের বড় মানুষেরা বিদেশী রাজত্বে তাঁদের মর্যাদা বা অধিকার হারিয়েছিলেন। তাই ব্রিটিশদের ওপরে তাঁদের আক্রোশ স্বাভাবিক। এঁরা চেয়েছিলেন প্রধানত বিদ্রোহ করে নিজেদের হারানো গৌরব আবার ফিরে পেতে। এই সব দুর্বলতা থাকলেও সিপাহী বিদ্রোহের মস্ত গৌরব এই যে এতে হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল।

এশিয়ার মধ্যে একমাত্র জাপানই সেদিন কোনোক্রমে পরাধীনতার লাঞ্ছনা থেকে বেঁচে যায়। সেখানেও নাক গলাবার চেষ্টা করে মার্কিনরা। কিন্তু অবস্থাগতিকে তারা বেশীদূর এগোতে পারে নি। কিন্তু এর ফলে জাপানের গায়ে লাগে আধুনিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ছোঁয়াচ।

তারই ফলে সেখানে ১৮৬৭ সালে বনেদী শাসকদের ক্ষমতা অনেকখানি খর্ব হয়। দেশের মধ্যে কলকারখানা তার পর থেকে দ্রুত বাড়তে থাকে। এ-সবের ফলে অল্পদিনের মধ্যেই জাপানের চেহারা ফিরে যায়। জাপান হয়ে দাঁড়ায় এক ধনতান্ত্রিক দেশ।

প্রথম আন্তর্জাতিকের ডাক

এক পাক ঘুরে আমরা দেখলাম যে, সারা দুনিয়া জুড়েই এইভাবে ধনতন্ত্রের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ছে। কোনোখানে দেশের লোকই সমাজের ধনতান্ত্রিক রূপান্তর ঘটিয়ে দেশকে বেশ শক্তিশালী আধুনিক রাষ্ট্র করে তুলেছে। কোথাও বা আমাদের দেশের মতো ধনতন্ত্র এসেছে বিদেশী বাহন চড়ে। সেখানে ধনতন্ত্রের ছোঁয়াচ লেগে দেশে বিস্তর ভাঙচুর ঘটেছে। কিন্তু বিদেশীদের বাধার ফলে সারা সমাজের পুরোদস্তুর ধনতান্ত্রিক রূপান্তর ঘটতে পারে নি। ফলে সেখানে ক্ষতি হয়েছে ষোলো আনা কিন্তু লাভ যৎসামান্য।

ধনতন্ত্রের প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সব দেশেই উদ্ভব হয়েছে মজুর শ্রেণীর। মার্কস ও এঙ্গেলসের কথা বলতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে, নানা দেশের শ্রমিক আন্দোলনকে একসূত্রে গেঁথে, এক লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাবার জন্যে তাঁরা উদ্যোগী হন 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ' প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে। ইতিহাসে মার্কস ও এঙ্গেলস-এর গড়া এই 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ' সংক্ষেপে 'প্রথম আন্তর্জাতিক' নামেই পরিচিত।

১৮৬৪ সালে 'প্রথম আন্তর্জাতিক'-এর প্রতিষ্ঠা। এ ব্যাপারে সব থেকে উৎসাহী ছিল ইংরেজ ও ফরাসী মজুরেরা। নানা দেশের মজুর আন্দোলন তখন নানা অবস্থায় থাকায় সংঘের চেহারা খুবই পাঁচমিশালি হয়ে দাঁড়ায়। ওয়েন-পন্থী, চার্টিস্ট, প্রুধঁ-পন্থী (ফরাসী মজুরদের ওপরে ঐ সময়ে প্রুধঁ-র যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তিনি মজুরদের সব রকম রাজনৈতিক আন্দোলন, এমন কি ধর্মঘটেরও বিরোধী ছিলেন। তিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না। অসংখ্য

ছোট ছোট কারিগরদের এক সমাজই ছিল তাঁর লক্ষ্য। আসলে ধনতন্ত্রের ফলে সর্বস্বান্ত কারিগরদেরই প্রতিনিধি ছিলেন প্রুধঁ), ব্লাঙ্কি-পন্থী, লাসাল-পন্থী (জার্মান মজুরদের সংঘবদ্ধ ও সচেতন করে তোলার ব্যাপারে লাসাল ছিলেন অগ্রণী। তিনিই কিন্তু মজুর আন্দোলনে আমদানি করেন নানা রকম সুবিধাবাদের ভেজাল। তাঁর ঝোঁক ছিল মজুর আন্দোলনকে নিছক পার্লিয়া-মেণ্টের কাজকর্মের মধ্যে আটকে রাখার। শেষ পর্যন্ত তিনি জার্মান মজুরদের চিরশত্রু বিসমার্কের সঙ্গে আপস করেন), মাৎসিনি বা ঐ ধরনের ইটালিয়ান বা পোলিশ জাতীয় বিপ্লবীরা ছিলেন এর মধ্যে।

গোড়ার দিকে 'প্রথম আন্তর্জাতিক'-এর প্রভাব বেশ বেড়ে ওঠে। তবে মার্কস ও এঙ্গেলসকে প্রথম থেকেই লড়াই চালাতে হয় প্রুধঁ-পন্থার বিরুদ্ধে। এর ফলে শেষপর্যন্ত বিভিন্ন দেশে ঐ মতবাদের প্রভাব খুব কমে যায়।

১৮৬৮ সাল থেকে মার্কস ও এঙ্গেলস-কে 'প্রথম আন্তর্জাতিক'-এর মধ্যে অবিশ্রাম লড়াই করতে হয় বাকুনিন নামে একজন অতিবিপ্লবীর উগ্র মতামতের বিরুদ্ধে। বাকুনিনের কথা ছিল, মজুরদের শুধু বলতে হবে কি করে সশস্ত্র বিপ্লব করা যায়। তিনি চাইতেন বিপ্লব মারফত রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে, আর মনে করতেন যে রাষ্ট্র ধ্বংস হলেই ধনতন্ত্রও আপনা থেকে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

বিপ্লবের জন্যে বাকুনিন-এর ভরসা ছিল সর্বস্বান্ত কৃষক ও সমাজবিরোধী কাজকর্মে জড়িত লোকদের ওপরেই। তিনি ভাবতেন, মার্কস মজুরদের খামাখা বাড়িয়ে তুলছেন। মার্কস ও এঙ্গেলস-এর সঙ্গে খোলাখুলি লড়াইয়ে তিনি পরাজিত হন কিন্তু তলে তলে তিনি চক্রান্ত করেন মার্কস, এঙ্গেলস ও 'প্রথম আন্তর্জাতিক'-এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। তাঁর এ-চেষ্টাও ব্যর্থ হয় ও চক্রান্ত করার জন্যে তাঁকে 'প্রথম আন্তর্জাতিক' থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এ-সবের ফলে কিন্তু সংঘ দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৮৭২ সালে লণ্ডন থেকে তার

দপ্তর নিউ ইয়র্কে সরানো হয়। সেখানে ৪ বছর কোনোগতিকে টিকে থাকার পর 'প্রথম আন্তর্জাতিক' উঠে যায় শেষ অবধি।

এইভাবে তার অকাল মৃত্যু ঘটলেও দুনিয়ার মজুর আন্দোলনের ওপরে 'প্রথম আন্তর্জাতিক'-এর প্রভাব খুবই স্থায়ী। কারণ প্রুধঁ বা বাকুনিন-এর সঙ্গে মার্কস ও এঙ্গেলস-এর লড়াই তো আর ব্যক্তিগত ঝগড়াঝাঁটি বা ক্ষমতা দখলের ব্যাপার ছিল না। সে লড়াইয়ের উদ্দেশ্য ছিল প্রুধঁ-পন্থা, বাকুনিন-পন্থা বা ঐ ধরনের নানা ভুল ও ক্ষতিকর মতামতকে হটিয়ে মজুর আন্দোলনের সত্যকার পথকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। ১৮৭০ সালে যখন ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে যুদ্ধ বাধে তখন 'প্রথম আন্তর্জাতিক' সেই অন্যায় খেয়োখেয়ির বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। জার্মান মার্কসবাদী বেবেল ও উইলিয়াম লিবক্নেখ্‌ট্‌-এর মতো 'আন্তর্জাতিক'-এর বিশিষ্ট সভ্যেরা যুদ্ধের ব্যয়-বরাদ্দের বিরুদ্ধে পার্লিয়ামেণ্টে দ্বিধাহীনভাবে ভোট দেন, আর তাই রাজদ্রোহী হিসেবে বরণ করেন দুবছরের কারাদণ্ড। এইভাবে সেদিন তাঁরা মজুরশ্রেণীর আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বের যে মহান আদর্শ স্থাপন করলেন তাতে অটল থাকা যে কত কঠিন অথচ কত প্রয়োজন, পরের যুগের ইতিহাস থেকেই আমরা তার প্রমাণ পাব ভূরি-ভূরি।

'প্যারিস কমিউন'-এর শিক্ষা

'প্রথম আন্তর্জাতিক'-এর বারো বছরের জীবন শেষ হওয়ার আগে, ১৮৭১ সালে এমন একটি ঘটনা ঘটে, মজুরদের এতদিনকার সংগ্রামের ইতিহাসে যার তুলনা নেই। সেই ঘটনা—'প্যারিস কমিউন'। তার আগে কয়েকটা কথা বলে নেওয়া দরকার।

১৮৭০ সালে ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে জার্মানির। দ্বিতীয় নেপোলিয়ন ভেবেছিলেন, এই যুদ্ধে তিনি ফরাসী সাম্রাজ্যের লুপ্ত গরিমা পুনরুদ্ধার করবেন। ব্যাপার দাঁড়াল ঠিক উল্টো। ফরাসী সাম্রাজ্য বাইরে থেকে জবরদস্ত মনে হলেও আসলে ছিল একেবারে

কাঁপা। যুদ্ধ লাগার মাত্র দু'মাসের মধ্যে মূল ফরাসী বাহিনী সমেত শত্রুর হাতে বন্দী হলেন স্বয়ং দ্বিতীয় নেপোলিয়ন।

এর ঠিক দু'দিন পরে, ১৮৭০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর আবার ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্ষমতা এসে পড়ে ধনিকদের হাত। ওদিকে জার্মানবাহিনী এসে অবরোধ করল প্যারিস। ঘটনার চাপে পড়ে অবরুদ্ধ রাজধানীর মজুরদের হাতে হাতিয়ার দিতে হয়, আর দেশরক্ষার জন্যে গঠিত 'জাতীয় রক্ষীবাহিনী'র সংখ্যা বাড়িয়ে করা হয় তিন লক্ষ। প্যারিসের মজুর ও মধ্যবিত্তেরা তোড়জোড় করতে লাগলেন প্যারিস রক্ষার।

ওদিকে ধনিকেরা যে প্রজাতন্ত্রী সরকার সদ্য গঠন করেছিল তাদের কিন্তু বাইরের জার্মানবাহিনীর চেয়ে দেশের সশস্ত্র মজুরকেই ভয় ছিল বেশি। তারা তাই বাইরে প্রতিরোধের ভান দেখিয়ে তলে-তলে ষড়যন্ত্র করছিল প্যারিসকে শত্রুর হাতে তুলে দেওয়ার। কিন্তু সে-কাজ নির্বিঘ্নে করতে হলে সবার আগে দরকার মজুরদের হাত থেকে হাতিয়ার কেড়ে নেওয়া। নতুন সরকারের নেতা থিয়ে সেই হুকুমই দিলেন। কিন্তু ফল হলো উল্টো। হুকুম শোনামাত্র শহরের মেয়েপুরুষ সমস্ত মজুর দলে দলে বেরিয়ে এলো হুকুমকে রুখতে। ১৮৭০ সালের ১৮ই মার্চ জাতীয় রক্ষীবাহিনীর কেন্দ্রীয় সমিতি দেশ-শাসনের ভার ঐ বিশ্বাসঘাতক সরকারের হাত থেকে তুলে নিল নিজের মুঠোয়। ঘোষণা করা হলো দুনিয়ার প্রথম শ্রমিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা। ইতিহাসে এরই নাম 'প্যারিস কমিউন।'

নতুন মজুর সরকার কিন্তু ধনিকদের বিশ্বাসঘাতক সরকারকে কিছু বললো না, বরঞ্চ তাদের সৈন্যবাহিনীসমেত নির্বিবাদে প্যারিস ছেড়ে ভের্সাই-তে চলে যেতে দিল। বড়লোকদেরও আটক রাখার কোনো চেষ্টা না করে চলে যেতে দেওয়া হলো শহর ছেড়ে। তারা কিন্তু ভের্সাইতে পৌছবার অল্পদিনের মধ্যেই কমিউন আক্রমণ শুরু ক'রে প্রতিদান দিল এই অবুঝ মহানুভবতার।

এ-সব থেকে বেশ বোঝা যায়, জাতীয় রক্ষীবাহিনীর নেতারা

হাওয়া কোন দিকে বইছে তা ধরতে পারেন নি। তা হলে তাঁরা অন্তত প্রজাতন্ত্রী সরকারের সৈন্যবাহিনীকে প্যারিস ছাড়তে না দিয়ে তাদের দলে টানার চেষ্টা করতেন। ভের্সাইতে পৌঁছবার ঠিক পরে ধনিকদের সরকার যখন 'কমিউন' আক্রমণের তেমন তোড়জোড় করে উঠতে পারে নি—সেই অপ্রস্তুত অবস্থায় তাকে আক্রমণ না করে ঐ নেতারা গৃহযুদ্ধ শুরু করার ভয়ে ও কিছুটা মিটমাটের আশায় পিছিয়ে রইলেন। তারপর ঐ রকম একটা জরুরী অবস্থায় নিজেদের হাতে ক্ষমতা না রেখে তাঁরা দেশশাসনের জন্য ব্যবস্থা করলেন এক 'কমিউন' নির্বাচনের। এতে দশ দিন নষ্ট করে তাঁরা খামাখা শত্রুপক্ষকে দম ফেলার মূল্যবান সময় দিলেন।

যে 'কমিউন সরকার' নির্বাচিত হলো তার মধ্যে জ্যাকোবিন ও ব্লাঙ্কি-পন্থীরা ছিলেন সংখ্যায় বেশি আর প্রুধঁ-পন্থীরা কম। জ্যাকোবিনরা ছিলেন চরমপন্থী মধ্যবিত্তদের প্রতিনিধি। তাঁরা প্রথম ফরাসী বিপ্লবের গণতান্ত্রিক আদর্শকেই মানতেন, সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন না—মজুর আন্দোলন বা সাম্যবাদী চিন্তার কোনো ধারও তাঁরা ধরতেন না। প্রুধঁ-পন্থীরা অমন জরুরী অবস্থাতেও ছিলেন কোনো রকম জবরদস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের বিরোধী। ব্লাঙ্কি-পন্থীদের কথা তো আমরা আগেই বলেছি।

'কমিউন'-এর পক্ষে তাই অবস্থা ছিল খুবই ঘোরালো। একদিকে কোনো স্পষ্ট কর্মসূচী নেই, তার উপরে নেই ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব। বড় ও মাঝারি রাজকর্মচারীরা সব পালিয়েছে ভের্সাইতে। 'ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্সের' ৩০০ কোটি ফ্রাঙ্ক 'কমিউন'-এর হাতে পড়েছিল বটে। কিন্তু সম্পত্তির ব্যাপারে মধ্যবিত্ত মনোভাবের দরুন সে টাকা বাজেয়াপ্ত করে নিজেদের কাজে না লাগিয়ে শেষ পর্যন্ত তারা তা রক্ষা করেছিল যক্ষের ধনের মতো। কৃষকদের সঙ্গেও প্যারিসের বাইরে বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারাও ছিল 'কমিউন'-এর মস্ত দুর্বলতা। এ সবের মূলে ছিল মজুরদের অনভিজ্ঞতা ও 'কমিউন'-এর মধ্যে মধ্যবিত্ত 'জ্যাকোবিনদের' প্রভাব।

তবু এতো ভুলত্রুটি সত্ত্বেও 'কমিউন' যে ছিল সত্যকার শ্রমিক-রাষ্ট্র তা বোঝা যায় তার অন্যান্য কাজকর্ম থেকে। যেমন, আইন তৈরি করা ও সে আইন প্রয়োগ করার জন্যে আলাদা আলাদা ব্যবস্থা না করে 'কমিউন' নিজেই ঐ দুই ভার গ্রহণ করে। স্থায়ী সেনাবাহিনীর জায়গায় সমস্ত জনসাধারণের হাতে 'কমিউন' হাতিয়ার তুলে দেয়—উঠিয়ে দেয় পুলিসবাহিনী। বিচারকদের নির্বাচনের বন্দোবস্ত করা হয় আর দরকার পড়লে তাঁদের পদত্যাগ করতে বাধ্য করারও ব্যবস্থা থাকে। ধনিকদের সম্পত্তি অবশ্য বাজেয়াপ্ত করা হয় নি ; কিন্তু যে-সব কলকারখানার মালিক প্যারিস ছেড়ে পালায় সেগুলিকে নতুন করে চালানোর জন্য মজুরদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বন্ধ হয় কারখানায় জরিমানার রেওয়াজ, রুটির কারখানায় বন্ধ হয় রাতভর কাজ আর মকুব হয় গরিবদের বকেয়া খাজনা।

এ ছাড়াও নিয়ম করা হলো 'কমিউন'-এর কোনো সদস্য জন-সমর্থনের আস্থা হারালে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য থাকবেন। সমস্ত রাজকর্মচারীকে নির্বাচিত হতে হতো, আর জনসাধারণের আস্থার অভাবে তাঁদের পদচ্যুত করাও চলত। তাঁদের মাইনেও বেশি ছিল না একজন দক্ষ মজুরের চাইতে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা গির্জার হাত থেকে 'কমিউন' নিজের হাতে তুলে নেয় ও তার জন্যে যাতে ছাত্রদের টাকা খরচ না করতে হয় তারও ব্যবস্থা করে। দেশশাসনের ব্যাপারে খাটো করা হয় পাদ্রীদের আধিপত্য।

এই সবের ফলে কমিউনের সঙ্গে ধনতান্ত্রিক যে-কোনো রাষ্ট্রের তফাত হয়ে গেল আকাশপাতাল। মার্কস এরই উল্লেখ করে বলেন যে, কমিউনের দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় যে মজুরেরা ক্ষমতা দখল করে আগেকার ধনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা দিয়ে কখনো কাজ চালাতে পারে না। সে-ব্যবস্থাকে চুরমার করে দিয়েই তাকে এগোতে হয়।

ধনিকদের সরকার কিছুদিনের মধ্যেই প্যারিসের ওপর অভিযান শুরু করে। জার্মানরাও একলক্ষ ফরাসী সৈন্যকে মুক্তি দেয় এই অভিযানে যোগ দেবার জন্যে। চারিদিক থেকে এইভাবে জার্মান ও

ফরাসী বাহিনী ঠেসে ধরল 'কমিউনকে। তারপর ২১শে মে থেকে প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায়, প্রতিটি ঘরে-ঘরে চললো যুদ্ধ। অবশেষে এক সপ্তাহ অবিশ্রান্ত রক্তক্ষয়ের পর ছেদ পড়ে 'কমিউন'-এর ৭২ দিনের গৌরবোজ্জ্বল জীবনে।

এই শেষ নয়। জার্মানদের সাহায্যে ফ্রান্সের গদিতে বসেই ধনিকরা গুলি করে মারল ২৫,০০০ নিরস্ত্র কমিউনার্ড (অর্থাৎ 'কমিউন'-এর সমর্থক) ও তাঁদের স্ত্রীপুত্র-পরিবারকে। প্রায় ১৪,০০০ জনকে পাঠাল নির্বাসনে।

মার্কস ও এঙ্গেলস সাগ্রহে তাকিয়ে ছিলেন 'কমিউন'-এর দিকে, যদিও গোড়ায় ফরাসী মজুরদের দুর্বলতার কথা ভেবে তাঁরা তাদের বিদ্রোহের বদলে ধনিকদের প্রজাতন্ত্রে যে কিছুটা বেশি অধিকার পাওয়াব সম্ভাবনা ছিল তারই সুযোগ নেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা যখন এগিয়ে গেল বিপ্লবের পথে তখন তাঁদেরই প্রস্তাব অনুসারে 'প্রথম আন্তর্জাতিক' 'কমিউন'কে অভিনন্দন জানায় ও শপথ নেয় সবরকম ভাবে তাকে সাহায্য করার। মার্কস-এর মতে 'কমিউন' হলো আগামী দিনের শ্রমিক-রাষ্ট্রের অঙ্কুর। ১৯১৭ সালে লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় যখন আবার শ্রমিক-রাষ্ট্রের পত্তন হয় লেনিন তখন প্রথমেই মনে করেছিলেন 'কমিউন'-এর কথা। তাঁর ভাষায়, "কোনো স্থানীয় বা সংকীর্ণ জাতিগত লক্ষ্য নিয়ে নয়, সমস্ত খেটে খাওয়া মানুষের জন্যে, দুনিয়ার সমস্ত পদদলিত ও লাঞ্ছিত মানুষের মুক্তির জন্যেই লড়েছিল 'কমিউন'—এজন্যেই সে মৃত্যুঞ্জয়ী।"

'কমিউন' ধ্বংস হওয়ার পর ইউরোপের মজুরদের মধ্যে কিছুদিনের জন্যে হতাশা দেখা দেয় 'প্রথম আন্তর্জাতিক' উঠে যাওয়ার পেছনে এও ছিল একটা কারণ। সরাসরি বিপ্লব করে ক্ষমতা দখলের বদলে সূচনা হয় মোটের ওপর একটা 'শান্তিপূর্ণ' পর্বের। ইউরোপে, বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপে, সাঙ্গ হয় ধনতান্ত্রিক রূপান্তরের পালা। বাকি সমস্ত দুনিয়াকে শোষণ করে সেখানকার ধনিকেরা

ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে। মার্কিন ও জাপানী ধনিকেরাও এ ব্যাপারে মোটেই পিছিয়ে থাকে নি।

এইভাবে সারা দুনিয়া জুড়ে শোষণ চালানোর ফলে ধনিকদের পক্ষে এই সময়ে সম্ভব হলো মজুরদের প্রতি, বিশেষত মজুরদের মধ্যে যাদের অবস্থা কিছুটা ভালো তাদের প্রতি, ছিটেফোঁটা দয়াদাক্ষিণ্য করা। মামুলি ধরনের ট্রেড ইউনিয়নের কাজও তাই অবাধে চলতে দেওয়া হয়। ১৮৬৭ সালে ইংরেজ মজুরেরা পায় ভোটের অধিকার।

এ সবের মারফত ক্রমাগত এ ধারণাই সৃষ্টি করা হতে থাকল যে, ধনতন্ত্রের মধ্যেই আছে মজুরের তথা সমস্ত মানুষের মুক্তি। এটাও জোর গলায় বলা হলো যে, ইংল্যাণ্ডে 'টোরি' ও 'হুইগ' (পরে 'কনজারভেটিভ্' ও 'লিবারাল') আর আমেরিকায় 'রিপাবলিকান' ও 'ডেমোক্র্যাট'—ধনিকদের এই দুই দলের সরকার অদলবদলের খেলার মধ্যেই নাকি রয়েছে গণতন্ত্রের শেষ কথা।

এ সব কথা যে কত ভুয়ো এশিয়া বা আফ্রিকার পরাধীন দেশগুলির দিকে এক পলক তাকালেই তা বোঝা যায়। কিন্তু শুধু কি তাই?

মাকড়সার জাল

উনিশ শতকের শেষ দিকে ধনতান্ত্রিক সমাজে কতকগুলি নতুন লক্ষণ দেখা যেতে থাকে। এই ব্যবস্থা চালু হওয়ার সময় বিভিন্ন পুঁজিপতিদের মধ্যে যে রেষারেষি দেখা যেত, তার জায়গায় এখন ক্রমেই অল্প সংখ্যক পুঁজিপতির একাধিপত্য বাড়তে থাকে। অনেকগুলি একই ধরনের ছোট ছোট শিল্প বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের জায়গা জুড়ে বসতে লাগল বিরাট বিরাট একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান। তাদের নাম ট্রাস্ট বা কার্টেল বা সিণ্ডিকেট। এগুলি ফুলে ফেঁপে উঠল ছোট কারবারগুলিকে গিলে খেয়েই।

দ্বিতীয়ত, কলকারখানার মালিকদের টাকা আর ব্যাঙ্কের পুঁজি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। তার ফলে সমাজে নতুন এক

ভীষণ জোরালো শক্তির উদ্ভব হলো—ফিনান্স পুঁজি। এর মালিকেরা ব্যাঙ্ক ও কলকারখানা, দুইয়ের ওপরেই প্রভুত্ব খাটাতে লাগল অবাধে।

তৃতীয়ত, নিজের দেশে পুঁজি খাটিয়ে যে হারে মুনাফা কামানো যায় তার থেকে অনেক বেশি পাবার লোভে ধনতান্ত্রিক দেশগুলি পরাধীন বা প্রভাবাধীন দেশগুলিতে পুঁজি চালান দিতে শুরু করল; সেখানে রাজনৈতিক আধিপত্যের জোরে ও সস্তায় মজুর খাটিয়ে মুনাফা মিলতে লাগল কোটি কোটি টাকা।

চতুর্থত, বড় বড় একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলি শুধু নিজের দেশ নয়—সারা দুনিয়াকে গ্রাস করতে চাইল। কিন্তু এ-ধরনের প্রতিষ্ঠানও একাধিক থাকায় তাদের শেষ পর্যন্ত দুনিয়ার বাজারকে ভাগ করে নিতে হলো আপন আপন এলাকায়।

পঞ্চমত, বড় বড় ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলি সারা পৃথিবীকে নিজেদের মধ্যে ভাগবাঁটরা করে এমন অবস্থার সৃষ্টি করল যে অন্যের ভাগ কেড়ে না নিয়ে নিজের ভাগ বাড়াবার আর কোনো উপায় রইল না। তাই অনিবার্য হয়ে উঠল পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ।

ধনতান্ত্রিক সমাজের বুকে ক্রমেই এই সব লক্ষণ ফুটে উঠতে লাগল। এর ফলে ধনতন্ত্রের যে নতুন পর্ব শুরু হলো তার নাম ইম্পিরিয়ালিজম বা সাম্রাজ্যবাদ।

এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজদের দখলদারির কথা আগেই বলা হয়েছে। উনিশ শতকের শেষে আফ্রিকাকেও সাম্রাজ্যবাদী মাকড়সার জালে জড়িয়ে পড়তে হয়। দেখতে দেখতে সারা মহাদেশ ভাগ হয়ে গেল সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে। সুয়েজ খাল খোলার পরে ইউরোপ-এশিয়ার মধ্যেকার এই অতিপ্রয়োজনীয় সড়কটির জন্যে ব্রিটেনের কাছে মিশরকে জলাঞ্জলি দিতে হয় তার স্বাধীনতা; সীমা-পরিসীমা রইল না আফ্রিকাবাসীদের ওপর সাম্রাজ্যবাদী শঠতা, শোষণ ও অত্যাচারের।

এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, 'প্যারিস কমিউন'-এর পরে যে

শান্তিপূর্ণ পর্বের কথা আমরা একটু আগে বলেছি আসলে তা কত ঠুনকো। কারণ ধনতন্ত্রের সাম্রাজ্যবাদী পর্বে ধনিক-শ্রমিকের দ্বন্দ্ব যেমন বহুগুণ বেড়ে গেল, তেমনই বাড়ল বিভিন্ন দেশের দখল নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে সংঘর্ষ আর সাম্রাজ্যবাদ ও পরাধীন দেশগুলির মধ্যেকার বিরোধ। আর এ সবের অনিবার্য পরিণতি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ।

এই নতুন বিপজ্জনক অবস্থার সামাল দেওয়ার মতো কি ব্যবস্থা ছিল সমাজের সব থেকে অগ্রণী অংশ, মজুরদের তরফে ?

মার্কসের মৃত্যুর পর ১৮৮৯ সালে আর একবার চেষ্টা হয় নানান দেশের মজুর আন্দোলনকে একসূত্রে গাঁথার জন্যে। প্রতিষ্ঠিত হয় মজুরদের 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক'। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী পর্বের যে সব লক্ষণের কথা আমরা বললাম, 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক'-এর অধিকাংশ নেতারা তা দেখতে পেলেন না বা দেখতে চাইলেন না। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও বলেন যে, সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে ঘাবড়াবার কিছু নেই—এর ফলে রেষারেষি উঠে গিয়ে সমাজ আরো মজবুত ও সংহত রূপ নিয়েছে—আর সে-রূপ হচ্ছে সমাজতন্ত্রেরই সূচনা। তাই সমাজতন্ত্রে পৌঁছবার জন্যে আর বিপ্লব লাগবে না, আপনা থেকেই সমাজের ঐ রূপান্তর ঘটবে ধীরে ধীরে।

স্পষ্ট বোঝা গেল, মার্কস ও এঙ্গেলস 'প্রথম আন্তর্জাতিক'-এর ভেতর দিয়ে যে বিপ্লবী চিন্তা পরিবেশন করেছিলেন 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক'-এর নেতারা তা বেমালুম জলাঞ্জলি দিতে বসেছেন ! আসলে মজুরদের মধ্যে একটা ওপরকার স্তর গড়ে উঠেছিল, যাদের অবস্থা বেশ কিছুটা ভালো। তারা যে-কোনোরকমে হোক ধনিকদের দলে ভিড়তে চায়। তারা তাই ভুলে থাকতে চায় ধনতন্ত্রের শোষণের দিকটা। গোটা মজুর সমাজের স্বার্থের বদলে তারা নিজেদের ধান্ধাতেই ঘোরে। সাম্রাজ্যবাদও দুনিয়া শোষণ ক'রে এদের মাঝে মাঝে বিতরণ করে ছিটেফোঁটা দাক্ষিণ্য। এরই থেকে মজুরদের সত্যকার বিপ্লবী চিন্তার ক্ষেত্রে আমদানি হয় নানা ভেজাল, নানা সুবিধাবাদী মত। বিলাতের

লেবর পার্টি, জার্মানির সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি, ফ্রান্সের সোশ্যালিস্ট পার্টির মতো মজুরদের বড় বড় রাজনৈতিক দল ঐ সময়ে গড়ে উঠলেও ওগুলিতে ঐ ধরনের ভেজাল ছিল যথেষ্ট রকমই। বাইরে শান্তি বজায় রেখে বিপ্লবের পথ ছেড়ে তাই ধনিকদের সঙ্গে আপসরফা করেই কাজ হাসিল করা যাবে—এমন এক ঝোঁক ঐ সব পার্টিতে ক্রমেই বেশি বেশি করে দেখা যেতে লাগল।

ভেজালের বিরুদ্ধে

এই সব ভেজালের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ালেন রুশ মজুর-আন্দোলনের নেতা লেনিন। অসহ্য দুরবস্থার বিরুদ্ধে রুশ মজুরেরা উনিশ শতকের শেষ দিকে নিজের থেকেই ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে আন্দোলন শুরু করেছিল। আবার ঐ সময়ে ইউরোপে প্লেখানভের মতো জনকয়েক নির্বাসিত রুশ বিপ্লবী মার্কসবাদের চর্চাও করছিলেন। এই দুইয়ের মিলন ঘটালেন লেনিন। রাশিয়াতেই থাকুন বা নির্বাসনে সাইবেরিয়া বা ইউরোপেই থাকুন, তিনি তাঁর সমস্ত কাজকর্ম ও লেখার মধ্যে দিয়ে মজুরদের একটি কথাই বোঝালেন: বিপ্লব ছাড়া মজুরের মুক্তি নেই, আর তার জন্যে তাদের এক নতুন ধরনের বিপ্লবী পার্টির প্রয়োজন।

সেই সাচ্চা পার্টিরই ভিত গাঁথলেন তিনি ১৯০৩ সালে লণ্ডনে রুশ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির দ্বিতীয় সম্মেলনে। সেখানে তিনি মার্কসবাদের পক্ষ নিয়ে নানা ভেজাল মতামতকে খণ্ডন করলেন আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সমর্থন পেলেন অধিকাংশ সভ্যের। এই জন্যেই লেনিনের মতবাদের নামকরণ হলো 'বলশেভিকবাদ' বা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতবাদ। আর যে অল্পসংখ্যক সুবিধাবাদী এই সম্মেলনে লেনিনের বিরুদ্ধতা করলেন তাঁদের মতবাদের নাম হলো 'মেনশেভিকবাদ' বা সংখ্যালঘুর মতবাদ।

লেনিন যে সেদিন সমস্ত রকম ভেজালের বিরুদ্ধে মার্কসবাদের বিপ্লবী নীতিকে সজোরে উপস্থিত করলেন তাই নয়। তিনি নতুন

পর্বে সে-নীতি কেমন করে কাজে লাগাতে হবে, মজুরদের তাও পরিষ্কার দেখিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, পশ্চিম ইউরোপে ধনতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা হয়ে গেলেও রুশ সমাজের এখনো পুরোপুরি ধনতান্ত্রিক রূপান্তর ঘটে নি। তাই স্বেচ্ছাচারী জারতন্ত্রের উচ্ছেদই হলো প্রথম কাজ। কিন্তু যেহেতু এ কাজটি ধনতান্ত্রিক বিপ্লবেরই কাজ তাই মেনশেভিকদের পরামর্শ মতো মজুরেরা হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না। তাদেরই চেষ্টা করতে হবে এ-বিপ্লবেরও নায়কতা করার। তবেই সে-বিপ্লব পুরোপুরি সার্থক হবে আর তারপর মজুরদের জবরদস্ত নেতৃত্বে তা এগিয়ে যাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে। ১৯০৫ সালে জাপানের হাতে পরাজয়ের কিছুদিন পরে রাশিয়ায় যখন প্রথম বিপ্লব ঘটে লেনিন তখনই তাঁর এই মত স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন। এই বিপ্লবের আগুনের মধ্যেই সেদিন প্রথম উদ্ভূত হয় জনসাধারণের এক নতুন ধরনের সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান: সোভিয়েত। এর খবর আমাদের নিতে হবে একটু পরে।

কিন্তু মজুরদের নেতৃত্ব তখন বলশেভিক ও মেনশেভিক—এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। কৃষকেরাও গোড়ার থেকেই এ আন্দোলনে নামে নি—মজুরদের সঙ্গে তাঁদের শক্ত এক বিপ্লবী জোটও গড়ে ওঠে নি। এই সব নানা কারণে অসমসাহসিক লড়াইয়ের পর সেদিন পরাস্ত হলো রাশিয়ার প্রথম বিপ্লব।

লেনিন কিন্তু এই পরাজয়ে হাল ছাড়লেন না। বরঞ্চ সে পরাজয়ের শিক্ষায় তিনি শিক্ষিত করে তুললেন পার্টিকে। তাঁর নেতৃত্বে অল্পদিনের মধ্যেই বলশেভিকরা এক মজবুত ও সাচ্চা মার্কসবাদী পার্টি গড়ে তুলতে পারলেন। 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক'-এর অন্তর্গত জার্মান বা ফরাসী পার্টির সঙ্গে এ-পার্টির তফাত আকাশপাতাল। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ লাগবার সঙ্গে সঙ্গেই সে-কথা প্রকট হয়ে উঠল।

দুনিয়াজোড়া খুনোখুনি

বিশ শতকের গোড়ার থেকেই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সংঘাতে দুনিয়ার আবহাওয়া ক্রমে গরম হয়ে ওঠে। জার্মান সাম্রাজ্যবাদ দেরিতে আসরে নেমে সোরগোল লাগাল দুনিয়ার নতুন ভাগবাঁটরার দাবি তুলে। বিপুল সাম্রাজ্যের মালিক ব্রিটেন বা ফ্রান্স এই হাঁকডাক মোটেই পছন্দ করছিল না। তাছাড়া প্রত্যেকেরই মতলব ছিল অন্যের দখল থেকে কিছু কিছু ছিনিয়ে নিতে। ১৯.৪ সালে তাই এক তুচ্ছ ছুতোয় শুরু হয়ে গেল প্রথম মহাযুদ্ধ—একদিকে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জারতন্ত্রী রাশিয়া, অন্য দিকে জার্মানি, অস্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া ও তুর্কি। পরে ইটালি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানও প্রথম পক্ষে যোগ দেয়।

প্রায় সাড়ে চার বছর ধরে চলে এই রক্তাক্ত যুদ্ধ। আর এরই কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে গেল নানা নেতা ও মতামতের দৌড়। 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক' যুদ্ধ বাধবার আগে বছর-বছর প্রস্তাব পাশ করত—মজুরেরা আসন্ন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে—এই কথা জানিয়ে। কিন্তু সুবিধাবাদের ভেজাল 'আন্তর্জাতিক'-এর ভেতরে গেড়ে বসেছিল। তাই যুদ্ধ লাগার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক'-এর সেরা শাখা, জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সদস্যেরা পার্লিয়ামেন্টে যুদ্ধ চালাবার ব্যয়বরাদ্দ অনুমোদন করে ভোট দিয়ে বসে আছে। ফ্রান্স, ব্রিটেন, বেলজিয়মের সমাজতন্ত্রীরাও এ ব্যাপারে পিছিয়ে রইল না। রাশিয়ার মেনশেভিকরাও সুর মেলালো এদের সঙ্গে। সমাজতন্ত্র বেমালুম হজম করে তারা একে একে দাঁড়িয়ে গেল আপন আপন ধনিক সরকারের পেছনে। 'মাতৃভূমি রক্ষার' ধুয়ো তুলে এরা নিজের দেশের মজুর ও সাধারণ মানুষকে ক্ষেপাতে লাগল অন্য দেশের মজুর ভাইদের রক্তে হাত রাঙাবার জন্য। প্যারিস কমিউন-এর সময়ে 'প্রথম আন্তর্জাতিক' সাচ্চা আন্তর্জাতিকতার যে মহান আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছিল সুবিধা-

বাদের পাঁকে 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক' তা জলাঞ্জলি দিল। কার্যত ধূলিসাৎ হলো 'আন্তর্জাতিক'।

লেনিনের নেতৃত্বে একমাত্র রাশিয়ার বলশেভিক পার্টিই সেদিন একেবারে গোড়ার দিন থেকেই স্পষ্ট ঘোষণা করল—এই যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। এতে মজুরের কোনো স্বার্থ নেই। যুদ্ধ যখন লেগেছেই তখন মজুরের এখন একমাত্র কাজ নিজের দেশের সরকারের পরাজয় ঘটিয়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করা, আর তারই মারফত বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করা। লেনিন তো এর আগেই মজুরদের দেখিয়ে দিয়েছিলেন—সাম্রাজ্যবাদী যুগে যেমন অন্তর্বিরোধের ফলে একদিকে মহাযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে, তেমনিই অনিবার্য হয়ে পড়ে শ্রমিক-বিপ্লব। বিপ্লব ও আন্তর্জাতিকতার মহান আদর্শের প্রতি এইভাবে সেদিন একনিষ্ঠ রইলেন শুধু বলশেভিকরা এবং জার্মান প্রভৃতি দেশের কিছু কিছু সাচ্চা কমিউনিস্টরা।

যুদ্ধ কিছুদিন চলবার পরে কিন্তু নানা দেশের মজুর ও সাধারণ মানুষেরও ক্রমে চোখ ফুটতে লাগল। তারা দেখল যুদ্ধের ফলে সব দেশের সাধারণ মানুষেরই কী অসম্ভব ক্ষয়ক্ষতি ও দুর্গতি সহ্য করতে হয়। অথচ ঐ সব দেশের ধনিকেরাই ঐ সময়েই মুনাফা লোটে দু'হাতে। এই চিন্তা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ইতিমধ্যে 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক'-এর ভরাডুবি ঘটায় কথা ওঠে নতুন করে আবার এক সত্যকার 'আন্তর্জাতিক' গড়ার। এরই জন্যে সুইজারল্যাণ্ডের জিমারভাল্ড শহরে ও পরে কিয়েনথাল গ্রামে নানান দেশের আন্তর্জাতিকতাবাদীদের পরপর দুটি সম্মেলন হয়। দেখা যায় যে, উপস্থিত সকলেই যুদ্ধের বিরোধিতার কথা বললেও এ ব্যাপারে মজুরদের কর্তব্য সম্পর্কে একমাত্র বলশেভিকদেরই ছিল স্পষ্ট ধারণা। তবু পরে 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক' গড়ার কাজে অনেকখানি সুবিধা হয় এই দুই সম্মেলনের ফলে।

যুদ্ধ যতই চলতে থাকে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা ততই দেশবাসীকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করতে থাকেন। সৈন্য ও নৌবাহিনীর মধ্যে তাঁরা ক্রমাগত বোঝাতে থাকেন—এই অবিরাম রক্তপাত ও দুর্গতির জন্যে দায়ী কে, আর বিপ্লব ছাড়া এর হাত থেকে বাঁচার কোনো পথ নেই। এমনকি যুদ্ধসীমান্তেও বলশেভিকরা দুই শত্রু বাহিনীর মধ্যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠার জন্য জোর প্রচার চালান। এইভাবে তিলে তিলে নিজেকে আসন্ন বিপুল দায়িত্ব বহনের উপযুক্ত করে তোলে বলশেভিক পার্টি।

এদিকে যুদ্ধের ফলে রাশিয়ার অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে উঠল। হাজারে হাজারে মানুষ যুদ্ধে মরল, মহামারীতে মরল—যারা বেঁচে রইল তারাও পৌঁছল দুরবস্থার চরম সীমায়। আর অন্যদিকে দেশের ধনিকরা বেশ ফেঁপে উঠল যুদ্ধের জোগান দিয়ে। একদিকে জারের সৈন্যরা জার্মানদের হাতে ক্রমাগত হারতে লাগল—অন্যদিকে জানা গেল জারের মন্ত্রীদের মধ্যেই বাহাল তবিয়তে রয়েছে শত্রুর চর। ১৯১৬ সাল নাগাদ দেশের বেশ বিস্তীর্ণ এলাকা চলে গেল জার্মানদের কবলে।

এ সবের ফলে মজুর, কৃষক, সিপাহী ও বুদ্ধিজীবী সবাই ক্ষেপে উঠল—তীব্র হলো বিপ্লবী আন্দোলন। অন্যদিকে ধনিকদের মধ্যেও আশঙ্কা দেখা দিল পাছে জার নিজেকে বাঁচাবার জন্যে জার্মানির সঙ্গে সন্ধি করে বসে সেই কথা ভেবে। তারাও তাই চক্রান্ত করতে লাগল জারকে হটিয়ে তার ভাইকে গদিতে বসাবার। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদী সরকারও যোগ দিল এই ষড়যন্ত্রে। এর আসল উদ্দেশ্য ছিল এইভাবে ক্ষমতা দখল করে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া আর ওপরতলার এই সাজানো বিদ্রোহ দিয়ে জনসাধারণের প্রচণ্ড বিক্ষোভ যাতে বিপ্লবে পরিণত না হয় তার ব্যবস্থা করা। এ সবের ফলে জার সরকার ক্রমশই একঘরে হয়ে পড়ল। অন্যদিকে জনসাধারণের মনে ঠাসা হতে লাগল বিপ্লবের বারুদ।

১৯১৭ সাল শুরু হলো আকাশে-বাতাসে সাধারণ ধর্মঘটের হাঁক-ডাকের মধ্যে। মজুরদের সভা ও মিছিল থেকে ক্রমেই বেশি বেশি করে শোনা গেল 'জার নিপাত যাক....বন্ধ হোক খুনোখুনি' ধ্বনি। দেখতে দেখতে লেগে গেল পথে পথে সশস্ত্র লড়াই। মজুরেরা সৈন্যদের ডাক দিয়ে বলল 'বন্দুক ঘুরিয়ে ধরো—বিপ্লবে যোগ দাও'। দলে দলে বহু সৈন্য সাড়া দিল সেই ডাকে। শেষ অবধি ১২ই মার্চ প্রবলপরাক্রান্ত জারকে ছাড়তে হলো সিংহাসন।

১৯০৫ সালের বিপ্লবের মতো এবারও সংগ্রামের মধ্যে থেকে উদ্ভব হলো মজুর ও সৈন্যদের সোভিয়েত। 'সোভিয়েত' ব্যাপারটা কি? এর আক্ষরিক অর্থ 'সমিতি' বা 'সংঘ'। কিন্তু আসলে 'সোভিয়েত' হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের সমিতি। একদিকে তা হচ্ছে ক্ষমতা দখলের জন্য সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সংগঠন, অন্যদিকে ক্ষমতা দখলের পর এটা হলো আবার নতুন ধরনের রাষ্ট্রশক্তিরও ঘাঁটি। কিন্তু বলশেভিকরা যখন পথে পথে লড়াই করছিলেন, প্রাণ দিচ্ছিলেন অকাতরে, মেনশেভিক ও অন্যান্য দলগুলি তখন ব্যস্ত ছিল প্রাণপণে সোভিয়েত-গুলিতে জায়গা দখলের কাজে এমনটা যে ঘটতে পারল তার আরো এক কারণ—মেনশেভিক নেতারা যখন স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে পারছিলেন রাজপথে তখনও লেনিনের মতো বলশেভিক নেতারা ছিলেন নির্বাসনে। এ জন্যে গোড়ার দিকে সোভিয়েতগুলিতে সুবিধাবাদীরাই ছিল দলে ভারী।

এর কয়েকদিনের মধ্যেই ধনিকদের 'ক্যাডেট' পার্টির নেতারা মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট রেভোলিউশনারি পার্টির সঙ্গে আপস করে এক 'অস্থায়ী সরকার' খাড়া করল। অর্থাৎ, একদিকে এই সরকার আর অন্যদিকে সোভিয়েত—পাশাপাশি উদ্ভব হলো দুই ধরনের রাষ্ট্রশক্তির।

এই দোটানা জটিল অবস্থায় পথ দেখালেন লেনিন। নির্বাসন থেকে দেশে ফিরে এসেই তিনি ঘোষণা করলেন, মার্চ মাসের বিপ্লব হচ্ছে ধনতান্ত্রিক বিপ্লব। এবারে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্তুতিই হলো

একমাত্র কাজ। এর জন্যে প্রথমেই দরকার সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে নেওয়া। তার জন্যে ধৈর্যের সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার চালাতে হবে আর মেনশেভিকদের মতো যারা সোভিয়েতগুলিতে বেশি আসন দখল করে বসে আছে, সকলের সামনে প্রকাশ করতে হবে তাদের স্বরূপ।

'অস্থায়ী সরকার' কিন্তু ওদিকে দিব্যি যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকল। জনসাধারণের অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট, যে কোনোরকমেই হোক যুদ্ধ বন্ধ করার জন্যে তাদের তীব্র কামনা—এ সব ঐ সরকার গ্রাহ্যই করল না। তারপর আবার 'অস্থায়ী সরকার'-এর মধ্যে কোনো কোনো ধনিক দলের সদস্যের কাজকর্ম অনেকের কাছেই সন্দেহজনক বোধ হচ্ছিল এর ফলে সোভিয়েতগুলিতে বলশেভিকদের শক্তি ক্রমশ বাড়তে লাগল। 'অস্থায়ী সরকার' এই শক্তিবৃদ্ধি অবশ্য মোটেই সুনজরে দেখল না। জুলাই মাসে তারা এক মিছিলের ওপর গুলি চালালো ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করল লেনিনের নামে। ফের আত্মগোপন করতে হলো লেনিনকে।

এর পর বলশেভিক পার্টি সরাসরি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে পা বাড়ালো। আত্মগোপনকারী নেতারা বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাণপণে তৈরি করতে লাগলেন বিপ্লবী সংগঠন। অবস্থা তখন খুবই ঘোরালো। কর্নিলভ নামে একজন সাবেক আমলের সেনাপতি চারিদিকের অব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে চক্রান্ত করছিল হঠাৎ ক্ষমতা দখলের। তার এ চেষ্টার পেছনে 'অস্থায়ী সরকার'-এর প্রধান মন্ত্রী কেরেনস্কিরও প্রচ্ছন্ন উস্‌কানি ছিল। কিন্তু গোপন অবস্থার মধ্যেও এই চক্রান্তকে বানচাল করার জন্য বলশেভিকদের ডাকে যখন হাজার হাজার মানুষ সাড়া দিতে শুরু করল তখন কেরেনস্কি ভাবল যে কর্নিলভকে রুখবার জন্যে জনসাধারণ যে সংগ্রাম শুরু করেছে তাতে সে নিজেও ভেসে যেতে পারে। তাই শেষ মুহূর্তে সে নিজেও কর্নিলভের ষড়যন্ত্র থেকে সরে দাঁড়াল। ব্যর্থ হলো কর্নিলভ-চক্রান্ত।

এ সবের ভেতর দিয়ে সোভিয়েতগুলিতে বলশেভিকদের প্রভাব

বহুগুণ বেড়ে যায়। মজুররা তো বটেই গরিব কৃষকরাও এবার দলে দলে বলশেভিকদের সঙ্গে যোগ দিতে শুরু করল; তারা বুঝতে পারল যে জমিদার ও সেনাপতির দল যদি একবার বলশেভিকদের ও সোভিয়েতগুলিকে ধ্বংস করতে পারে তা হলে তারা কৃষকদেরও ছেড়ে কথা কইবে না। এই সবের ফলে ক্রমে ক্রমে সোভিয়েতগুলিতে বলশেভিকরাই দলে ভারী হয়ে উঠলেন।

নভেম্বর বিপ্লব

'সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা চাই': সর্বত্রই শোনা যেতে লাগল এই আওয়াজ। ১৯১৭ সালের ৬ই নভেম্বর সকাল থেকে কেরেনস্কি সরকারের সঙ্গে বলশেভিকদের শক্তিপরীক্ষা শুরু হয়। লেনিন বেরিয়ে এলেন তাঁর গোপন আস্তানা থেকে। ৭ই নভেম্বর বলশেভিকদের নেতৃত্বে বিপ্লবী ফৌজ একটার পর একটা শত্রুর ঘাঁটি দখল করতে থাকে। ঐ দিনই বিখ্যাত 'উইন্‌টার প্যালেস' অধিকার করে গ্রেপ্তার করা হলো 'অস্থায়ী সরকার'-এর মন্ত্রীদের।

৭ই রাত্রে সোভিয়েতদের সম্মেলন ঘোষণা জানায়—সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি এখন সোভিয়েতের মুঠোয়। ঐ সম্মেলনই আর দুটি ঘোষণা প্রকাশ করে। প্রথমটিতে সমস্ত যুধ্যমান জাতিগুলির কাছে আবেদন জানানো হয়—অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য। বিশেষ করে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মান মজুরদের আহ্বান জানানো হলো শান্তি স্থাপনে অগ্রণী হতে। অন্যটিতে জমিদারদের মালিকানা-স্বত্ব বিনা ক্ষতিপূরণে খতম করা হয়। জার, গির্জা ও জমিদারদের সমস্ত জমি, অর্থাৎ ৪০ কোটি একর জমি বিনামূল্যে তুলে দেওয়া হয় কৃষকদের হাতে। এর ফলে তারা বাঁচল বছরে ৫০ কোটি স্বর্ণ রুবল খাজনার দায় থেকে।

অর্থাৎ, প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুনিয়ার এই প্রথম সাফল্যমণ্ডিত শ্রমিকরাষ্ট্র জগতের মানুষকে দেখাল প্রকৃত শান্তির পথ ও দেশের মানুষকে জোগাল খেয়ে-পরে বাঁচার প্রতিশ্রুতি মাত্র নয়, যথার্থ সঙ্গতি।

নভেম্বর বিপ্লব হলো দুনিয়ার প্রথম সার্থক মজুর-বিপ্লব। এর আগে বহুদিন ধরে নানা দেশের মজুররা বারবার লড়াই করেছে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে, কখনো বা 'প্যারিস কমিউন'-এর মতো চেষ্টা করেছে ক্ষমতা দখলেরও। তাদের সে আশ্চর্য লড়াই পরে সাহস ও প্রেরণা জুগিয়েছে ভিন-দেশের মজুরকে। কিন্তু তা হলেও তখনকার মতো ব্যর্থ হয়েছে তাদের নির্ভীক সংগ্রাম।

নভেম্বর বিপ্লব তবে সার্থক হতে পারল কেন?

পারল তার কারণ—দু-দল সাম্রাজ্যবাদী যখন মরণপণ লড়াই-এ জড়িয়ে পড়েছে তখনই ঘটে এই বিপ্লব। এদের কোনো পক্ষই তাই বিপ্লব দমনের জন্যে তার পুরো শক্তি লাগাতে পারে নি। বিপ্লবের পক্ষে এটা ছিল একটা মস্ত সুযোগ।

দ্বিতীয়ত, প্রায় চার বছর ক্রমাগত রক্তপাতের পর দুনিয়ার সমস্ত মানুষ সেদিন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল শান্তির জন্যে। তারা অবাক হয়ে দেখল বিপ্লবী রাশিয়া কিভাবে শান্তি আনল আর তাদের নিজেদের দেশে আর অন্যদেরও খোলাখুলি ডাক দিল শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে। পশ্চিম দেশের মজুর আর পূর্ব দেশের পরাধীন মানুষ, এদের সকলেরই তাই বিপ্লবের প্রতি দরদ স্বাভাবিক।

তৃতীয়ত, যুদ্ধের ফলে সারা দুনিয়ায় সাধারণ মানুষের দুর্গতি ঐ সময়ে এমন হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, সব দেশেই তখন ঘনিয়ে উঠেছিল একটা প্রচণ্ড মরিয়া ভাব। রাশিয়ার ওলটপালটে তাই ঘাবড়ানো দূরে থাকে, বরঞ্চ তাকেই তারা নানাভাবে সমর্থন করেছিল বিপ্লবী সহকর্মীর মতো।

কিন্তু এ সবই হলো বাইরেকার ব্যাপার। বিপ্লব ঘটিয়েছিল তো রাশিয়ারই মানুষ। দেশের ভেতরে যদি জোর না থাকে তাহলে বাইরেকার হাজার সুযোগ-সুবিধাতেও কোনো ফল হতে পারে না। কাজেই এ ব্যাপারে ঘরের কথা খুবই জরুরী। নিশ্চয়ই তাই বিপ্লবের সাফল্যের আসল কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে রাশিয়ার মধ্যেই। কী সে কারণ?

প্রথমত, দেশের প্রায় সমস্ত মজুর সেদিন বিপ্লবকে সমর্থন করেছিল, যোগ দিয়েছিল বিপ্লবে।

দ্বিতীয়ত, কৃষক ও সিপাহীদের মধ্যেও এ-বিপ্লব খুবই ব্যাপক সমর্থন পায়। তারা বুঝেছিল জমি পাবার, শান্তি স্থাপনের এই হলো সত্যকার পথ।

তৃতীয়ত, বিপ্লবের নেতা ছিল বলশেভিক পার্টির মতো বহু লড়াই, বহু হারজিতের অভিজ্ঞতায় পাকাপোক্ত মজবুত রাজনৈতিক দল।

চতুর্থত, দেশের মধ্যে ধনিকেরা শ্রেণী হিসাবে খুবই দুর্বল ছিল। বহুদিনের একটানা কৃষক বিদ্রোহের আঘাতে আঘাতে জর্জর ছিল ফিউডাল জমিদারেরা, আর যুদ্ধের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে গিয়েছিল মেনশেভিকদের মতো আপস-পন্থী পার্টির দৌড়। তাই বিপ্লবের শত্রুরা কিছুটা কম-জোর থাকায় তাদের হটানো ততো কঠিন হয় নি বিপ্লবীদের পক্ষে।

পঞ্চমত, রাশিয়ার মতো বিশাল দেশে বিপ্লবী যোদ্ধাদের পক্ষে সুযোগ মতো এগোনো এবং দরকার হলে পিছু হটার বিস্তর সুবিধা ছিল—সুবিধা ছিল দম নেওয়ার, শক্তি সংগ্রহের।

আর তার সঙ্গে দেশের মধ্যেই ছিল বিপ্লবী লড়াই চালানোর মতো খাদ্য, কাঁচা মাল, জ্বালানি বা ঐ ধরনের দরকারী রসদের ব্যবস্থা।

ঘরে-বাইরের এই সব অবস্থার দরুনই নভেম্বর বিপ্লব সেদিন সফল হয়ে ওঠে।

কিন্তু রুশ বিপ্লব কি শুধু রাশিয়ারই বিপ্লব? তার ফলাফল কি সীমাবদ্ধ রইল শুধু রাশিয়ার মধ্যেই?

না। এ বিপ্লবের ফলে সারা দুনিয়ার মধ্যে এই প্রথম একটা দেশের মজুরেরা রাষ্ট্রের নায়ক হিসেবে দেখা দিল। এই বিপ্লবী দৃষ্টান্ত এর পর থেকে একটানা প্রেরণা জোগাতে লাগল সব দেশের মজুরকেই।

দ্বিতীয়ত, বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তি পেল বিশাল রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত পরাধীন জাতিগুলি। চীন-পারস্যের মতো দুর্বল প্রতিবেশী রাজ্যের ওপরে জারতন্ত্রী রুশিয়া যে জুলুম-জবরদস্তি খাটাত অবিলম্বে তার অবসান হলো—দুনিয়ার ইতিহাসে প্রথম স্থাপিত হলো বিভিন্ন জাতির পাশাপাশি বন্ধুভাবে শান্তিময়, উন্নত জীবনযাত্রা গড়ে তুলবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পরাধীন দেশের মানুষের কাছে নভেম্বর বিপ্লব তাই খুলে দিল নতুন যুগের সড়ক।

তৃতীয়ত, এতদিনে সারা পৃথিবীর বিপ্লবী আন্দোলনের একটা স্থায়ী, মজবুত ঘাঁটি তৈরি হলো নভেম্বর বিপ্লবের ফলে। এমন একটা কেন্দ্র তৈরি হলো যার চারিদিকে মালিক দেশের মজুর ও পরাধীন দেশের সাধারণ মানুষ একজোট হতে পারে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে।

আর সব শেষে নভেম্বর বিপ্লব যে দেশে দেশে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ওলটপালটই করল এমন নয়, চিন্তাজগতেও তা ঘটালো একটা বিপ্লব। বিশেষ করে দুনিয়ার মজুরের মনে এর ফলে পোক্ত হলো মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শ।

যুদ্ধ শেষের ঝড়ো হাওয়া

যুদ্ধের ফলে দুনিয়ার সব দেশের সাধারণ মানুষের দুর্গতি চরমে পৌঁছয়। সারা পৃথিবী জুড়েই সেদিন তাই এক ঝোড়ো হাওয়া বইতে থাকে। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এক যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাব। এর পরে আবার সোভিয়েট বিপ্লবের ছোঁয়াচ আর ব্রেস্টলিটভস্ক চুক্তি মারফত রাশিয়ার সত্যসত্যই শান্তি প্রতিষ্ঠা—সব দেশেরই, বিশেষ করে জার্মন সৈন্যবাহিনী ও জনসাধারণের মধ্যে এই মনোভাবকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

এর ফলে ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে জার্মানিতে বিপ্লব শুরু হয়। কাইজারকে পালাতে হয় দেশ ছেড়ে।

কলকারখানার দিক থেকে বলা যায়, জার্মানি ছিল খুব উন্নত দেশ। কিন্তু আমরা দেখেছি, ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের সময়ে সেখানকার

ধনিকেরা সেকেলে বনেদী বংশের লোকদের সঙ্গে আপস করে। বিসমার্কের দৌলতে রাষ্ট্রের ঐক্য প্রতিষ্ঠাও হয় ওপর থেকেই। তাই বরাবরই জার্মানির সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অবস্থা বেশ কিছুটা সেকেলে থেকে গিয়েছিল। জার্মান সমাজের এই পিছিয়ে-পড়া অবস্থার দরুন ১৯১৮ বিপ্লবের চরিত্র ছিল মোটের ওপর ধনতান্ত্রিক। সেখানেও বিপ্লবের ফলে মজুর ও সৈন্যদের যে সোভিয়েতের উদ্ভব হয়—তার মধ্যে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক-মার্কা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরাই ছিল দলে ভারী। তাই সোভিয়েতগুলি শেষ পর্যন্ত রয়ে গেল ধনিক পার্লিয়ামেন্টেরই একান্ত অনুগত। কার্ল লিবক্নেখট ও রোসা লুক্সেমবুর্গের মতো সাচ্চা বিপ্লবীরা 'স্পার্টাকুস লীগ' বলে যে সত্যকার বিপ্লবী সংঘ মারফত কাজ চালাচ্ছিলেন, তার শক্তি এদের তুলনায় কম ছিল। এই সব দুর্বলতার দরুন জার্মান বিপ্লব শেষ পর্যন্ত পরাস্ত হয়—নিহত হন লিবক্নেখট ও লুক্সেমবুর্গ।

এর পর প্রায় সারা ইউরোপেই বিপ্লবের ঢেউ বয়ে যায়। হাঙ্গেরিতে গঠিত হয় এক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র বেলা কুন নামে একজন কমিউনিস্টের নেতৃত্বে, যদিও সেখানেও ঘরে-বাইরের নানা শত্রুর চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত সে সরকার টিকতে পারে নি। অন্যান্য দেশে বিপ্লবী সরকার গঠিত না হলেও সেখানেও জন্ম নিল মজুরদের নতুন ধরনের রাজনৈতিক দল, কমিউনিস্ট পার্টি।

যুদ্ধের সময় থেকে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত পার্টিদের চরম বিশ্বাসঘাতকতার দরুন লেনিন সত্যকার আন্তর্জাতিকতাবাদী বিপ্লবীদের নতুন এক সংঘ গড়ার কথা বলে আসছিলেন। বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি গড়ে ওঠায় এবার সত্যসত্যই তার পত্তন সম্ভবপর হলো। ১৯১৯ সালে বলশেভিক পার্টির উদ্যোগে এদের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলন থেকেই জন্ম নেয় 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক' বা 'কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল'। মার্কস ও এঙ্গেলস পরিচালিত 'প্রথম আন্তর্জাতিক'-এর যোগ্য উত্তরাধিকারী হলো এই নতুন 'আন্তর্জাতিক'।

ইউরোপের অন্য সব দেশেও জনসাধারণের বিক্ষোভ অনেক সময়ে বিদ্রোহের রূপ নেয়। কিন্তু সোভিয়েতকে টুঁটি টিপে মারবার জন্যে ফরাসীরা যখন ১৯১৯ সালে যুদ্ধজাহাজ পাঠায় তখন তার নাবিকেরা বিদ্রোহ করে বসে। ইংল্যাণ্ডের মজুরেরাও সোভিয়েতের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের হামলা বন্ধ করার জন্যে সারা দেশে আন্দোলন চালায়—অস্বীকার করে জাহাজে অস্ত্রশস্ত্র তুলতে। এরই ফলে সাম্রাজ্যবাদীদের শেষ পর্যন্ত সোভিয়েতের বিরুদ্ধে হামলা থামাতে হয়। এ সবই হচ্ছে আন্তর্জাতিক মজুর ঐক্যের চমৎকার দৃষ্টান্ত।

শুধু ইউরোপই নয়, এশিয়ার পরাধীন দেশগুলির নাড়িও এ সময়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষেও ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে উত্তাল হয়ে ওঠে বিক্ষোভ। মজুরেরা শুরু করে ধর্মঘট, দাবি আদায়ের জন্যে গড়তে থাকে তাদের ট্রেড ইউনিয়ন। অবস্থা চরমে ওঠে পাঞ্জাবে। ১৯১৯ সালে সেখানে ব্রিটিশ সরকার জালিয়ানওয়ালা বাগ নামে এক বাগানে নিরস্ত্র জনসভার ওপরে বেপরোয়া গুলি চালিয়ে হতাহত করে তিন হাজারেরও বেশি নারী-পুরুষকে। তার পরেও তারা পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি করে দিনের পর দিন অকথ্য অত্যাচার চালাতে থাকে সাধারণ মানুষের ওপর। এরই প্রতিবাদে আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ সেদিন রাজার দেওয়া খেতাব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রকাশ করেন দেশবাসীর অন্তরের জ্বালা।

উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেস জনসাধারণের দাবিদাওয়া নিয়ে সম্পূর্ণ আইনসঙ্গতভাবে দেশে আন্দোলন করে আসছিল। এর নেতৃত্বে ছিলেন দেশের ধনিক-জমিদারদের প্রতিনিধিরাই। তবু জনসাধারণের বিক্ষোভ সেদিন কংগ্রেসকে নামায় সরাসরি সরকার-বিরোধী কাজকর্মে। স্কুল, কলেজ, কাছারি ছেড়ে বেরিয়ে আসা, বিলিতী জিনিস বর্জন—এই ধরনের অসহযোগই ছিল সেই কংগ্রেসী আন্দোলনের রূপ। কিছুদিনের মধ্যেই কিন্তু গণ-আন্দোলনের জোয়ার এই কংগ্রেস-নির্দিষ্ট সীমানা

পেরিয়ে যাবার উপক্রম করে। গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস তখন আন্দোলনের রাশ টানল। ইংরেজরাও আন্দোলনের প্রসারে কিছুটা ঘাবড়ে গিয়ে চাইছিল তাড়াতাড়ি একটা মিটমাট। এ অবস্থায় সামান্য কিছুটা শাসনসংস্কারের ভিত্তিতে একটা বোঝাপড়া হয়ে গেল দুই পক্ষে। অসহযোগ ছেড়ে তাই কংগ্রেস ঢুকল আইনসভায়। দেশকে সত্যকার বিপ্লবী পথে চালিত করার সম্ভাবনা যাদের মধ্যে ছিল, সেই মজুরেরা তখন সংগঠিত আন্দোলন শুরু করেছে সবেমাত্র। তাই সেদিন সম্ভব হলো না এর বেশি এগোনো।

চীনে ব্যাপারটা দাঁড়াল অন্যরকম। সেখানে অপদার্থ মাঞ্চুবংশের শাসন ১৯১১ সালেই খতম হয়। কিন্তু তাতে দেশের অবস্থা ফেরে নি। ঘরে সনাতন সামন্ততন্ত্রের দাপট আর বাইরে সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের ক্রমাগত হামলা চলতেই থাকে। দেশে কোনো কেন্দ্রীয় শাসনের বালাই ছিল না—দেশের আসল কর্তা ছিল বিভিন্ন অঞ্চলের জমিদার-ডাকাতেরা।

যুদ্ধশেষের ঝোড়ো হাওয়ায় এই অচল-অনড় সমাজও কিন্তু কেঁপে ওঠে। ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে সেখানে জাপানী ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে শুরু হয় এক মস্ত আন্দোলন। এতে মধ্যবিত্ত ও ছাত্রদের পাশাপাশি লড়াই করে মজুরেরা। এ সবের মধ্যেই ১৯২১ সালে গড়ে ওঠে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি। অন্যদিকে বিখ্যাত দেশপ্রেমিক ডাঃ সুন ইয়াৎ-সেন এর-নেতৃত্বে তখনকার দিনের জাতীয় প্রতিষ্ঠান, কুওমিনটাং চেষ্টা করছিল চীনকে স্বাধীন, ঐক্যবদ্ধ ও গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত করার। এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গোড়ার দিকে চীনের ধনিক ও মধ্যবিত্তেরাই দলে ভারী ছিল। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি—এই তিন মূল নীতি আর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রী, জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মৈত্রী ও কৃষক-মজুরদের মধ্যে আন্দোলন গড়ে তোলা—এই তিন কর্মনীতির ভিত্তিতে ডাঃ সুন ইয়াৎ-সেন সেদিন সারা দেশকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার

ডাক দেন। খাঁটি দেশপ্রেমিক হিসাবে চীনের কমিউনিস্টরা সাড়া দেন সেই ডাকে। কুওমিনটাং-কমিউনিস্ট পার্টির এক মিলিত জোট বিপ্লবী অভিযান শুরু করে উত্তর চীনের সামন্ত সমরনায়কদের বিরুদ্ধে।

গোড়ায় এই উত্তাল অভিযানের মুখে খড়কুটোর মতো ভেসে যায় শত্রুদের প্রতিরোধ। তাতে কিন্তু ঘাবড়ে যায় ধনিকেরা—অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদীরাও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে তাদের জুলুমবাজির বারোটা বাজার সূচনা লক্ষ্য করে। দুই পক্ষই তখন তলে তলে চক্রান্ত করতে থাকে বিপ্লবী অভিযান ও মিলিত জোটের বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত চিয়াং কাই-শেক নামক এক বিশ্বাসঘাতক নেতা হঠাৎ বন্দুক ঘুরিয়ে খুন করতে শুরু করে মজুর, কৃষক ও কমিউনিস্টদের। এর ফলে ভেঙে যায় জাতীয় ঐক্য। দেশ টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আগের মতোই।

যুদ্ধের শেষে তুর্কিতেও মুস্তাফা কেমাল পাশার নায়কতায় জেগে ওঠে জাতীয় আন্দোলন। যুদ্ধে জার্মানির সঙ্গী হিসাবে তুর্কির পরাজয়ের পরে সাম্রাজ্যবাদীরা পুরনো তুর্কি সাম্রাজ্য তো ভাগাভাগি করে নেয়ই, এমনকি নানাভাবে চেষ্টা করতে থাকে পৃথিবীর বুক থেকে তুর্কির নামটাই মুছে দেবার। কেমাল পাশার নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলন সে-চক্রান্ত ব্যর্থ করে। তুর্কি আবার উঠে দাঁড়ায় মাথা চাড়া দিয়ে।

বেসামালকে সামলাবার কসরত

এ-সব ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে গোটা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা এখন এমন বেকায়দায় পড়েছে যার থেকে তার আর মুক্তি নেই। কারণ, সারা পৃথিবী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যাওয়ার ফলে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ না বাধিয়ে কোনো সাম্রাজ্যবাদী দেশের পক্ষে তার বাজার আর বাড়ানো অসম্ভব। অথচ মালপত্র তৈরি করার ক্ষমতা তার হাতে এত জমেছে এবং দিন দিন তা এত বেশি করে জমছে যে বাজার না বাড়লেও তার চলে না। শুধু মহাযুদ্ধের ফলেই যে এমন

বেসামাল অবস্থা হলো তা নয়। বরঞ্চ সে-যুদ্ধও তো এই বেকায়দা অবস্থারই ফল। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে ও তারপরে সব দেশের সাধারণ মানুষের দুর্গতি হাজার গুণ বেড়ে গিয়ে ঘোরালো অবস্থাকে আরো ঘোরালো করে তুললো। তার ওপরে আবার পৃথিবীর ছ'ভাগের একভাগ, অর্থাৎ তার গোটা সাম্রাজ্য সমেত রাশিয়া বিপ্লবের ফলে সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় অবস্থা আরো জটিল হয়ে উঠল। সাম্রাজ্যবাদ পড়ল একটা একটানা বেসামাল অবস্থার ঘূর্ণিপাকে।

কিন্তু এই বেসামাল অবস্থার খানিকটা সামাল দেওয়া কি কোনো ক্রমেই সম্ভব ছিল না? অবস্থার উনিশ-বিশ হওয়ার পথও কি একেবারে বন্ধ ছিল? না, তা নয়। ১৯২২-২৩ সালের পর থেকে বরং দেখা গেল বিপ্লবের স্রোতে কিছুটা ভাটা পড়ছে। খুব ধীরে ধীরে হলেও সব গণতান্ত্রিক দেশেই উৎপাদনও খানিকটা বাড়তে লাগল। ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা উদ্যোগী হয়ে গড়ে তুললো এক 'লীগ অফ নেশনস' বা 'জাতিসংঘ'—অবশ্য তাতে তারাই হলো মাতব্বর। জার্মানির সঙ্গে ভের্সাইতে স্বাক্ষরিত হলো এক সন্ধিপত্র। অর্থাৎ, সব দিক থেকেই বেসামাল অবস্থা কিছুটা গুছিয়ে আনল সাম্রাজ্যবাদীরা।

শুধু তাই নয়। যুদ্ধের ঝড়ঝাপটা থেকে দূরে থেকে ঐ ক'বছরে আমেরিকা দুনিয়াজোড়া তেজারতি করে ও অবাধে শিল্পকারখানা গড়ে তুলে বেশ শাঁসালো হয়ে উঠেছিল। ব্রিটেনকে হাটিয়ে সে তাই হয়ে দাঁড়াল দুনিয়ার সব থেকে ধনী দেশ। যুদ্ধের পরও সে ক্রমাগত তার মালপত্র বাড়াতে থাকে আর দুহাতে খয়রাতী কড়ি ছড়িয়ে সারা দুনিয়াময় গড়ে তোলে তার মাতব্বরী। এ সব দিক দিয়ে তার অগ্রগতি এত চটকদার হলো যে চারিদিক থেকে রব উঠল, এ-উন্নতির কোনো সীমা-পরিসীমা নেই, দুঃখ-কষ্টের সমস্যার এবার চিরতরে সমাধান হয়েছে। প্রত্যেকেরই এবার মিলবে মোটরগাড়ি, অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা।

কিন্তু এত করেও শেষরক্ষা হলো না—শেষরক্ষা হবার নয় বলেই। কারণ ঐ সোরগোল ঠিক যখন সপ্তমে চড়েছে এমন সময় ১৯২৯ সালে ঐ খাস মার্কিন মুলুকেই হঠাৎ এলো এক ভীষণ বিপর্যয়। দেখতে দেখতে মহামারীর মতো ব্যাঙ্কের পর ব্যাঙ্ক ফেল পড়ল, কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেল, ব্যাঙ্কে বা কারখানায় শেয়ারে যাদের টাকা খাটত রাতারাতি তারা পথের ভিখারী হয়ে গেল, বেকার লোকের সংখ্যা গুনতির বাইরে চলে গেল, একলাফে বেড়ে গেল আত্মহত্যাকারী ও পাগলের সংখ্যা। আর যেহেতু মার্কিন খয়রাতী কড়িতে বাঁধা ছিল নানা দেশের টিকি তাই মহাজনের সর্বনাশ সেই টিকিতে বাঁধা অভাগা খাতকদেরও ডোবাল সর্বনাশের রসাতলে।

দানবের আবির্ভাব

সেই রসাতলের সুড়ঙ্গপথে আবির্ভূত হলো এক ভয়ঙ্কর দানব। তার নাম ফ্যাশিজম্। ধনিকদের পক্ষ থেকে যুদ্ধশেষের ঝোড়ো হাওয়াকে সামাল দেবার জন্যেই ১৯২২ সাল নাগাদ ইটালিতে এর উদ্ভব। ইটালির মজুরেরা তখন সারা দেশে ধর্মঘট করে, অনেক জায়গায় তারা কারখানাও দখল করে বসেছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে একতা ও কোন পথে এগোতে হবে তার কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তাদের জবরদস্ত পার্টিও ছিল না বলশেভিক পার্টির মতো। অপর দিকে ধনিকদের পক্ষেও অবস্থা ছিল সাংঘাতিক রকম বিপজ্জনক। সেই বেসামাল অবস্থা সামাল দেবার জন্যে তারা এই ফ্যাশিজম-এর কড়া দাওয়াই আবিষ্কার করল। এ আর কিছু নয়—বেনিটো মুসোলিনি নামে ইটালির সোশ্যালিস্ট পার্টির একজন বিতাড়িত সভ্যকে নেতা করে তারা গোপনে টাকা ছড়িয়ে একদল বেপরোয়া, গুণ্ডা ধরনের লোক জড়ো করল এবং দেশে যেটুকু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল তা চুরমার করে তাদের হয়ে ক্ষমতা দখল করতে পিছন থেকে কলকাঠি নাড়তে লাগল। ঐ গুণ্ডারাই হলো 'ফ্যাশিস্ট', আর তাদের চিন্তা-ভাবনা, কাজকর্মের নাম ফ্যাশিজম।

ধনিকদের টাকায় গদিতে চড়ে এরা চরম অত্যাচার চালালো মজুরদের ওপর। হাজার হাজার মজুর-নেতা নিহত হলেন, কেড়ে নেওয়া হলো মজুর ও সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার অধিকার। এক কলমের খোঁচায় বাতিল হয়ে গেল দেশের নিয়মতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার আড়াল। দেশ চলতে লাগল মুসোলিনির হুকুমে কিন্তু যাত্রাদলের ভীমের হাঁকডাকের আড়ালে আসলে ঐ কলকাঠি নাড়তে থাকল ইটালির ধনিকেরাই—এ কথা ভুললে চলবে না।

শুধু ইটালির মতো কিছুটা পিছিয়ে-পড়া দেশেই নয়, ১৯২৯ সালে মার্কিন মুল্লুক থেকে যে অর্থনৈতিক সর্বনাশ মহামারীর মতো সারা ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল তা সামাল দেবার জন্যে এবার ফ্যাশিজম-এর দরকার পড়ল জার্মানির মতো শিল্পপ্রধান দেশেও। একে পরাজিত দেশ হিসাবে তার তখন নাজেহাল অবস্থা, তার ওপরে মার্কিন মহাজন দেউলে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জার্মানিরও হাল ভেঙে পড়ার মতো হয়ে দাঁড়াল। এর থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে জার্মান মজুরেরা ঝুঁকতে শুরু করে কমিউনিস্ট পার্টির দিকে। ইটালির মতো এখানেও পাছে ফ্যাশিস্ট অনাসৃষ্টি দেখা দেয় সেই আশঙ্কায় কমিউনিস্টরা সোশ্যালিস্টদের কাছে একজোট হওয়ার জন্যে আবেদন জানায়। কিন্তু বহুদিন ধরে সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্টদের মধ্যে চলছিল শত্রুতা। জার্মান মজুর-আন্দোলনের এটাই ছিল মস্ত দুর্বলতা। তাই ঐক্য হলো না শেষ অবধি।

জার্মান ধনিকদের পক্ষে ব্যাপারটা তবু চরম বিপজ্জনকই ছিল। এহেন জটিল অবস্থায়, যখন ধনিকদের নিজস্ব পার্টিগুলি মোটেই সুবিধা করতে পারছিল না, তখন আর কোনো উপায় না দেখে ধনিকেরা ত্রাণকর্তা হিসেবে ফ্যাশিস্ট নেতা হিটলারের দিকে ফেরে। মুসোলিনির দোসর হিসাবে হিটলার কিছুদিন থেকেই তার নাৎসী দল নিয়ে মজুরদের উপরে গুণ্ডামি করে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু এতদিন তার তেমন সুযোগ আসে নি। এবার ধনিকদের টাকা ও সব রকম

সাহায্যে ১৯৩৩ সালে সে চেপে বসল গদিতে। তারপর কমিউনিস্টরা নাকি শাসন পরিষদে আগুন দিয়েছে—এই মিথ্যা ধুয়া তুলে কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী করা হলো। এরপর শুরু হলো অবাধ গুণ্ডামি, ঠকামি ও মিথ্যার রাজত্ব। হাজার হাজার বিপ্লবী মজুর, কৃষক, কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্ট হিটলারের হাতে প্রাণ দিলেন—আরো বেশি সংখ্যককে পোরা হলো জেলে। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের শ্রেষ্ঠ নেতা, বুলগারিয়ার বিপ্লবী ডিমিট্রভকে পর্যন্ত এই শাসন পরিষদে আগুন দেবার মিথ্যে মামলায় জড়ানো হয়। কিন্তু তীক্ষ্ণযুক্তি ও আশ্চর্য নির্ভীকতার জোরে তিনি প্রমাণ করেন যে আসলে আগুন জ্বালিয়েছে নাৎসীরাই। তাঁর মুক্তির জন্যে সারা পৃথিবীতে আন্দোলন চলে। ফলে, ডিমিট্রভকে ছেড়ে দিতে হয় শেষ পর্যন্ত।

ফ্যাশিজমের এই আবির্ভাব আচমকা মনে হলেও আসলে ধনতন্ত্রের যে একটানা বিপত্তির কথা আমরা একটু আগেই বললাম, তারই এক ধরনের প্রকাশ এটা। ধনতন্ত্রের আসন যেখানে টলে সেখানে মজুরেরা রাশিয়ার মজুরদের মতো সংঘবদ্ধ ও সুপরিচালিত হয়ে ক্ষমতা দখল যদি না করতে পারে, তা হলে দেশে ফ্যাশিস্ট অনাসৃষ্টির আশঙ্কা দেখা যায়। কারণ চরম বেসামাল অবস্থাকে সামাল দেবার জন্যে ধনিকদের পক্ষে তখন আর সম্ভব হয় না গণতন্ত্রের ধার ধারার। বল্গাহীন অত্যাচার চালিয়ে, নিজেদেরই গড়া নিয়মতন্ত্র, পার্লিয়ামেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থা তছনছ করে তখন তাদের দরকার হয় খোলাখুলি গুণ্ডাগিরির। ধনিকদের পক্ষে তাই ফ্যাশিজম হলো টিকে থাকার শেষ অস্ত্র। তাই গুণ্ডামি, ডাকাতিতে ধনতন্ত্রের শক্তির পরিচয় মেলে না—প্রমাণ হয় এটা খাবি-খাওয়া রোগীর শেষ মরিয়া হাত-পা ছোঁড়া অবস্থামাত্র।

ধনতন্ত্রের এই খোলাখুলি নিষ্ঠুর একাধিপত্য শুধু ইটালি বা জার্মানিতেই নয়, তার লক্ষণ দেখা গেল অন্য দেশেও। যেমন, জাপানে গণতান্ত্রিক আন্দোলন বরাবরই দুর্বল ছিল। সেখানেও সমাজে ফ্যাশিস্ট লক্ষণ স্পষ্ট ফুটে উঠতে লাগল। এমন কি ফ্রান্সেও ১৯৩৪ সালে ফ্যাশিস্টরা ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে। তবে ফ্রান্সের বিপ্লবী

মজুরেরা পাল্টা আন্দোলন চালিয়ে ফ্যাশিস্টদের বাধ্য করে পিছু হটতে।

অন্য দুনিয়ায়

ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার যখন এই হাল নতুন সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার চেহারা তখন কী দাঁড়াল?

বিপ্লবের পর পাঁচ বছর ধ'রে সোভিয়েতে বিদেশী দস্যুর হামলা আর গৃহযুদ্ধ চলে, তা আমরা আগেই দেখেছি। তাতে সারা দেশ প্রায় ধ্বংসের মুখে পৌঁছে যায়। যাহোক বলশেভিকদের অসম-সাহসিক নায়কতায় ঘরে-বাইরের শত্রু পরাস্ত হয়।

জার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিপ্লবের ফলে যে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলি গড়ে উঠেছিল ১৯২২ সালে লেনিন ও স্তালিনের প্রস্তাবে সেগুলি স্বেচ্ছায় মিলিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন নামে এক মহাজাতিসংঘের মধ্যে। দম ফেলার অবকাশ পেয়ে লেনিনের নির্দেশে দেশে চালু হয় এক নতুন অর্থনৈতিক নীতি। এর ফলে দেশের অবস্থা কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯২৪ সালে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী লেনিন মারা যান। সারা পৃথিবীর শ্রমজীবী মানুষ শোকে মুহ্যমান হয় এই মহান নেতার মৃত্যুতে। কিন্তু ধনিকেরা খুশি হয় এই ভেবে যে এবার পথের কাঁটা দূর হলো—এইবার খতম করা যাবে সোভিয়েতকে।

কিন্তু খতম হওয়া দূরে থাক, শিল্পের দিক থেকে দেশের পুরোপুরি রূপান্তরের যে-পথ লেনিন দেখিয়েছিলেন তাই ধরে সোভিয়েত ইউনিয়ন বরং বেশ জোর কদমেই এগিয়ে চললো। সঙ্গে সঙ্গে আবার সদ্য-প্রতিষ্ঠিত কলকারখানার বাড়তি চাহিদা মেটানো ও শহরগুলির বেড়ে-ওঠা জনসংখ্যার খাদ্য জোগানোর মতো যাতে বাড়তি কাঁচামাল, বাড়তি খাদ্য পাওয়া যায় তার জন্যে কৃষকদেরও উদ্বুদ্ধ করা হলো—আলাদা আলাদা ছোট ছোট জমিতে চাষ না করে অনেক জমি এক করে একত্র চাষবাস করতে। তাতে সরকারের পক্ষে সুবিধে

যন্ত্রপাতি বা রাসায়নিক সার জোগানোর, আবার এর ফলে ফসল অনেক বেড়ে যাওয়ায় প্রত্যেক চাষীর ভাগেও পড়ে আগের চেয়ে বেশি অংশ।

আমরা দেখেছি, ধনতান্ত্রিক দুনিয়া চরম বিপাকে পড়ে ১৯২৯ সালে। ঠিক সেই বছরেই স্তালিনের সুদৃঢ় নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন কাজ শুরু করল তার বিখ্যাত 'প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা'র। এর উদ্দেশ্য ছিল পিছিয়ে-পড়া অবস্থা দূর করে দেশকে শক্তিশালী, শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত করা। ঠিক যে চার বছর ধনতান্ত্রিক দুনিয়া সব থেকে ভয়ঙ্কর সংকটের পাঁকে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছিল সেই চার বছরেই পূর্ণ হলো প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা। দেখা গেল, দুই দুনিয়ার দুই হাল।

এ-কাজ কিন্তু সহজে হয় নি। দেশকে শিল্পপ্রধান করার জন্যে অন্য দেশের কাছ থেকে যন্ত্রপাতি পাওয়ার জো তো ছিলই না—বরঞ্চ তাদের তরফে পদে পদে সব রকম বাগড়া দেওয়া হলো অগ্রগতির পথে। দ্বিতীয়ত, ঘরের শত্রুরও অভাব ছিল না। ট্রটস্কি, জিনো-ভিয়েভ, কামেনেভ-এর মতো নেতারা নানা অজুহাতে ভেতর থেকে সব কিছু বানচাল করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কেউ কেউ বললেন, শিল্পায়ন মারফৎ সোভিয়েত দেশকে মজবুত করা আমাদের মতো বিপ্লবীদের কাজ নয়, আমাদের কাজ লাল ফৌজ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া ধনতান্ত্রিক দেশগুলির ওপরে। সোভিয়েত রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসাবে স্তালিন এ ধরনের বিপ্লবীপনার জবাবে বলেন, প্রত্যেক দেশকেই বিপ্লব করতে হবে নিজের জোরে, বিপ্লব স্যুটকেসে ভরে অন্য দেশে চালান দেবার জিনিস নয়। লাল ফৌজ নিয়ে অন্য দেশে অভিযানের মতো গোঁয়া-র্তুমির একমাত্র ফল হবে সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করা। তাই সোভিয়েতকে দুর্ভেদ্য বিপ্লবী দুর্গে পরিণত করাই হলো বিশ্ববিপ্লবকে এগিয়ে আনার পক্ষে সব থেকে জরুরী কাজ।

ট্রটস্কি ও তার বন্ধুরা এ কথা মানলেন না। কখনও বা মানবার ভান করে তলে তলে চক্রান্ত চালালেন সোভিয়েতের বিরুদ্ধে। বারবার

তাদের সাবধান করা হলো এর জন্যে। কিন্তু তারা নিরস্ত হলেন না। এর ফলে শেষ পর্যন্ত এদের অনেককেই চরম শাস্তি ভোগ করতে হয়। ট্রটস্কি পালিয়ে যান বিদেশে।

ঘরে-বাইরে এই ধরনের বাধাবিপত্তি পেরিয়েই সেদিন চললো সোভিয়েত ইউনিয়নের দুঃসাহসী অভিযান। শিল্প, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতি আশ্চর্য দ্রুত গতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হলো। জারের আমলে যেসব জাতির মধ্যে ছিল খেয়োখেয়ির সম্পর্ক তাদের গভীর ভালোবাসা ও ঐক্যবদ্ধ অগ্রগতি সারা পৃথিবী অবাক হয়ে দেখল। আর ঠিক সেই সময়েই ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় দেখা গেল জনসাধারণের চরম দুর্গতি, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে অবিশ্বাস আর রেষারেষি, পরাধীন দেশগুলির ওপরে অকথ্য অত্যাচার ও শোষণ আর ফ্যাশি-জমের নৃশংস তাণ্ডব নৃত্য।

হুমকি, তোয়াজ, সর্বনাশ

ফ্যাশিজম যে মানুষকে মানুষ ব'লে গণ্য করে না, ধনিকদের লুট করার মতলবকে খোলাখুলি জবরদস্তি খাটিয়েই হাসিল করতে চায়, এ ঘটনা আমরা আগেই দেখেছি। কিন্তু এই নিষ্ঠুরতা ও জুলুমবাজি শুধু নিজের দেশেই নয়—অন্য দেশের ওপরে জবরদস্তি, এমন কি তাকে পুরোপুরি গ্রাস করাও ফ্যাশিজমের একটা বৈশিষ্ট্য।

১৯৩৯ সালে জাপান বিনাবাক্যব্যয়ে দুর্বল চীনের কাছ থেকে মাঞ্চুরিয়া (ক্রমশ প্রায় সমস্ত উত্তর চীন) ছিনিয়ে নিয়ে প্রথম এই ধরনের গুণ্ডামির পথ দেখায়। ১৯৩৫ সালে মুসোলিনি বর্বর অভিযান চালিয়ে অধিকার করে প্রায় নিরস্ত্র আবিসিনিয়াকে।

এরপর ১৯৩৬ সালে এলো স্পেনের পালা। এর কিছুদিন আগে সেখানে যেসব দল স্পেনের সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে উদগ্রীব ছিল তাদের একটি জোট নির্বাচনে জয়লাভ করে। তারাই গঠন করেছিল নতুন সরকার। জার্মানির ও ইটালির কিন্তু ঘরের পাশে এমন বেয়াড়া ব্যাপার পছন্দ হয় নি। তারা তাই স্পেনের হবু

ফ্যাশিস্ট ডিক্টেটর,জেনারেল ফ্রাঙ্কো-কে অস্ত্রশস্ত্র, টাকাকড়ি জোগাতে লাগল সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্যে। শুরু হলো সেখানে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে ফ্যাশিস্ট বিদ্রোহ।

এ ছাড়া ছিল আরো এক বিপদ।

ফ্যাশিজমের জন্মের সময় থেকেই দেখা যাচ্ছিল যে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মতো বনেদী সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলি নানাভাবে তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। ব্রিটেন তো জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ প্রায় খোলাখুলিই সমর্থন করেছিল আর ব্যবসাবাণিজ্য, ঋণ—সব দিক থেকেই পোষকতা করছিল হিটলারের। এমন কি ১৯৩৫ সালে ব্রিটেনের সঙ্গে নাৎসী জার্মানীর নৌবাহিনী-সংক্রান্ত এক বোঝাপড়াও হয়। অবশ্য ইটালি যখন আবিসিনিয়ার ওপরে হামলা শুরু করে তখন গোড়ায় গোড়ায় প্রধানত ব্রিটেন ও ফ্রান্সের স্বার্থে চালিত 'লীগ অফ নেশনস' তার বিরুদ্ধে কাগজপত্রে সামান্য একটু ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কেউই কিন্তু সেটাকে আমল দেওয়ার দরকার বোধ করে নি। বরঞ্চ ব্রিটিশ বৈদেশিক মন্ত্রী স্যামুয়েল হোর তলে তলে ব্যবস্থা করছিলেন মুসোলিনির হাতে আবিসিনিয়া তুলে দেবার জন্যে।

স্পেনের বেলাতে একই ব্যাপার দেখা গেল। ফ্যাশিস্টদের সুবিধা করার জন্যে ব্রিটেন এবারে হঠাৎ আবিষ্কার করল এক তাজ্জব প্যাঁচ। তার নাম 'হস্তক্ষেপ না-করার' (Non Intervention) নীতি। —অর্থাৎ দেশের আইন অনুসারে নির্বাচিত পুরোপুরি বৈধ সরকার আর তার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহী ফ্যাশিস্ট গুণ্ডার দল—এই মুড়ি-মিছরীর নাকি একই দর হবে। শুধু তাই নয়, এর আসল মানে দাঁড়াল—অন্য কোনো দেশের পক্ষে স্পেন সরকারকে সাহায্য করার উপায় রইল না। কিন্তু যে গুণ্ডারা কোনোদিনই কোনো চুক্তি বা প্রতিশ্রুতির বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা রাখে নি সেই ফ্যাশিস্ট সরকারেরা অম্লানবদনে ফ্র্যাঙ্কোর জন্য সৈন্যসামন্ত, অস্ত্রশস্ত্র পাঠাতে লাগল। একদিকে সরাসরি ফ্যাশিস্ট হস্তক্ষেপ, আর এক দিকে এই

সাম্রাজ্যবাদী 'হস্তক্ষেপ না-করার' কপটতা—এই দু-ফলা সাঁড়াশির চাপে টুঁটি টেপা হতে লাগল প্রজাতন্ত্রী স্পেন সরকার।

এই দম-আটকানো অবস্থার মধ্যে সেদিন একটিমাত্র উজ্জ্বল আলোর ঝলকানি দেখা গিয়েছিল। সেই আলোর ঝলকানির নাম—'আন্তর্জাতিক বাহিনী'। পৃথিবীর প্রায় সব দেশের মহাপ্রাণ মজুর, কৃষক, সাধারণ মানুষ, রাজনৈতিক কর্মী, জ্ঞানী-গুণীরা দলমত-জাতি-ধর্মের কিছুমাত্র পরোয়া না করে রাইফেল হাতে যোগ দিয়েছিলেন এই ফ্যাশিজমকে রুখবার জন্যে।

এত বীরত্ব এত আত্মদানও কিন্তু সেদিন ধাবমান ইতিহাসের মুখ ফেরাতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদের ফ্যাশিস্ট তোয়াজের নীতির বলি হতে হলো স্পেনকে।

এর ফল গড়াল অনেকদূর। ফ্যাশিস্ট শক্তি বুঝল যে 'লীগ অফ নেশনস' দিয়ে তাদের সত্যসত্যই ঠেকাবার কোনো মতলব ব্রিটেন বা ফ্রান্সের নেই। তাই ও-সব বাধ্যবাধকতার বালাই চুকিয়ে জার্মানি, জাপান ও ইটালি একে একে ঐ সংস্থা বর্জন করল—আরো খোলাখুলি গুণ্ডামি চালানোর সুবিধার জন্যে। আজ জাপান উত্তর চীনে হামলা করে, কাল ইটালি দখল করে আলবানিয়া, তার পরের দিন জার্মানি ছিঁড়ে ফেলে তার পুরনো চুক্তিপত্র—এই রকমই চলতে লাগল একটার পর একটা ঘটনা।

এই বিপজ্জনক অবস্থার মোড় ফেরাবার জন্যে সোভিয়েত সেদিন প্রাণপণে চেষ্টা চালায়। ফ্যাশিস্ট দেশগুলি 'লীগ অফ নেশনস' ছেড়ে দেবার পরই লীগকে পররাজ্য গ্রাস বন্ধ করার উপযুক্ত হাতিয়ার হিসাবে গড়ে তুলবার জন্য সোভিয়েত প্রাণপাত চেষ্টা করে। বারবার সে সব দেশকে সাবধান করে যে হিটলার যতই 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক' বা সাম্যবাদের বিরুদ্ধে গলাবাজি করুক না কেন, আসলে সে ব্রিটেন বা ফ্রান্সের মতো দেশকেও সময় মতো ছেড়ে কথা কইবে না। কোনো দেশই আজ ফ্যাশিস্ট লোভের মুখে নিরাপদ

নয়—তাই কোনো একটি দেশের নিরাপদে থাকার আসল উপায় হলো সকলে যাতে নিরাপদে থাকতে পারে তারই ব্যবস্থা করা।

কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। ব্রিটেন বা ফ্রান্সের ধনিক শাসকেরা স্বদেশের স্বার্থের চাইতে সেদিন বড় করে দেখল নিজেদের মুনাফাকেই। তারা তাই কর্ণপাত করল না সোভিয়েতের সাবধান বাণীতে।

শুধু কি তাই? ১৯৩৬ সালে আসন্ন ফ্যাশিস্ট অভ্যুত্থান ঠেকানোর জন্য ফ্রান্সে কমিউনিস্ট, সোশ্যালিস্ট, র‍্যাডিক্যাল—সমস্ত ফ্যাশিস্ট-বিরোধীরাই একজোট হয়ে এক সরকার তৈরি করে। কিন্তু ফরাসীদেশের বড় বড় ধনিকেরা প্রথম দিন থেকেই সেই সরকারকে গদি থেকে হটাবার জন্যে উঠে পড়ে লাগে। পাছে তাদের মুনাফার ওপর কোনো হাত পড়ে সেইজন্য এই সরকারের বিরুদ্ধে তারা শুরু করে জঘন্য কুৎসা ও চক্রান্ত। ব্রিটেনের ধনিকেরাও যোগ দেয় এই চক্রান্তে। অন্যদিকে এই মিলিত সরকারের প্রধান মন্ত্রী, লিওঁ ব্লুম ও তাঁর সোশ্যালিস্ট পার্টির দুর্বল, সুবিধাবাদী নীতিও ফ্যাশিস্ট-বিরোধী জোটের মধ্যেই ঘুন ধরাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তাই বানচাল হয়ে যায় ঐ জোট আর তার সরকার। স্পষ্ট বোঝা গেল, সর্বনাশের আর দেরি নেই। বাকি ছিল শুধু বিশ্বাসঘাতকতার চরম মুহূর্তটি।

সেই মুহূর্তটি এলো ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। জার্মানির মিউনিক শহরে চেম্বারলেন, দালাদিয়ে, হিটলার ও মুসোলিনি—ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও ইটালির এই চার প্রধানের মন্ত্রণাসভা বসল। আলোচনার বিষয়—চেকোশ্লোভাকিয়ার ভবিষ্যৎ। এরই মধ্যে হিটলার অস্ট্রিয়া গ্রাস করে নাছোড়বান্দা দাবি জানাচ্ছিল চেকোশ্লোভাকিয়া দখলের। চেম্বারলেন ও দালাদিয়ে 'না' করতে পারলেন না। এমনি ভাবেই পেছন থেকে ছুরি চালিয়ে খুন করা হলো ছোট্ট চেকোশ্লোভাকিয়াকে।

এ কথা থেকে এমন মনে করা ঠিক হবে না যে, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কর্তাদের সঙ্গে হিটলার-মুসোলিনির পুরোপুরি মনের মিল হবে

গিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে অমন মিল অসম্ভব। কিন্তু এর পেছনে ব্রিটেন ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের ছিল একটা প্যাঁচালো উদ্দেশ্য। সেটা হলো ফ্যাশিস্ট শক্তিদের নানাভাবে তোয়াজ ক'রে তাদের সোভিয়েতের সঙ্গে লড়িয়ে দেওয়া। তাহলে বেশ দূর থেকে মৌজ করেই বাঘের খেলা দেখা চলবে। একদিকে শ্রেণী-শত্রু সোভিয়েত খতম হবে, অন্যদিকে জার্মানির মতো প্রতিদ্বন্দ্বীও ঘায়েল হয়ে পড়বে। আর তখন তো সাম্রাজ্যবাদীদের পোয়াবারো।

এই চালে কিন্তু একটু ভুল ছিল। ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসেই স্তালিন তা দেখিয়ে দিলেন চোখে আঙুল দিয়ে। তিনি স্পষ্ট জানালেন যে, সাম্রাজ্যবাদীদের এই মারাত্মক ফ্যাশিস্ট-তোয়াজের প্যাঁচ উল্টে তাদেরই কাবু করতে পারে।

ছ'মাস না যেতেই ঘটল ঠিক সেই অঘটনই। এর মধ্যে সবাই মিলে চেকোশ্লোভাকিয়াকে গুণ্ডার হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে, সবাই মিলে গুণ্ডা ঠেকানোর জন্যে, নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার জন্যে, সোভিয়েতের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। ব্যর্থ হলো সোশ্যালিস্ট পার্টিগুলির কাছে 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক'-এর ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে মজুরদের একজোট করার আর সেই জোটের মজবুত বনিয়াদের 'পরে সমস্ত জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার আকুল আবেদন। অগত্যা তখন সোভিয়েতকে ধরতে হলো নিজের পথ। আপন নিরাপত্তার জন্যে সে জার্মানির সঙ্গে চুক্তি করল—কেউ কারো বিরুদ্ধে লড়বে না। অর্থাৎ, যার জন্যে সাম্রাজ্যবাদীদের এত প্যাঁচ-কষাকষি, বানচাল হয়ে গেল সেই চক্রান্ত সাময়িকভাবে।

এর কয়েকদিনের মধ্যেই জার্মানি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করল, আর তারই সূত্রে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে যুদ্ধ বাধল জার্মানির সঙ্গে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিকে হিটলার দারুণ রকম জিততে থাকে। সব থেকে তাজ্জব ঘটনা তার হাতে কয়েক মাসের মধ্যে ফ্রান্সের মতো দেশের বিপর্যয়। একদিক থেকে অবশ্য এতে অবাক হওয়ার আর কী আছে? ১৯৩৭ সালে ফ্যাশিস্টবিরোধী সরকার নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর ফ্রান্সের বড় বড় ধনিকদের সরকার চরম বিশ্বাসঘাতকতার পথ ধরে। তাই হিটলালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পরেও তারা তার সঙ্গে লড়াই করার চাইতে বেশী উৎসাহী ছিল দেশের মজুর ও কমিউনিস্টদের ওপরে অবিরাম হামলা চালানোতেই। এই সরকারের আশেপাশে এমন বহু লোক ঘোরাফেরা করত—আসলে যারা ছিল হিটলারেরই চর। এমন সরকার দিয়ে স্বভাবতই দেশরক্ষা হতে পারে না। তাই যুদ্ধ বাধবার অল্পদিনের মধ্যেই ফ্রান্সকে পরতে হলো নাৎসীদের শিকল।

এরপর হিটলার যতই একটার পর একটা দেশ জয় করতে থাকে ততই সেই সব দেশের জনসাধারণ মরিয়া হয়ে লড়াই করতে শুরু করে ফ্যাশিস্ট জবরদস্তির বিরুদ্ধে। ঐ ধরনের সব লড়াইয়ে একেবারে সামনের সারিতে ছিল দেশের মজুর ও তাদের নেতা কমিউনিস্ট পার্টি।

১৯৪১ সালের ২২শে জুন হিটলার অনাক্রমণের চুক্তিপত্র ছিঁড়ে ফেলে হঠাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করে। তার ফলে গোড়ায় গোড়ায় লাল ফৌজকে পিছু হটতে হয় এবং বেশ ক্ষয়ক্ষতিও সহ্য করতে হয়। কিন্তু তাতে মোটেই দমে না গিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন স্তালিনের সুদৃঢ় নেতৃত্বে প্রাণপণে লড়াই চালাতে থাকে। আর তারপর ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার সঙ্গে গড়ে ওঠে তার হিটলার-বিরোধী সংগ্রামী জোট।

হিটলারী শাসনের বিরুদ্ধে অন্যান্য পদানত দেশগুলির সাধারণ মানুষের লড়াইয়ে যে ঘটনাস্রোতের শুরু, তারই চূড়ান্ত পরিণতি

ঘটল জার্মানির বিশ্বাসঘাতক অভিযানের বিরুদ্ধে দুনিয়াজোড়া বিপ্লবের দুর্গ, সোভিয়েত ইউনিয়নের আশ্চর্য প্রতিরোধ-সংগ্রামে। এর পর থেকে আর কোনো সন্দেহ রইল না যে এই লড়াইয়ের হারজিতের ওপরেই নির্ভর করছে পৃথিবীর মানুষের ভবিষ্যৎ—তারা ফ্যাশিস্ট দাসত্বে দিন কাটাবে, না সব থেকে নৃশংস সাম্রাজ্যবাদকে খতম করে পরিষ্কার করার চেষ্টা করবে তাদের উন্নতির পথ। ফ্যাশিস্ট শক্তিকে ধ্বংস করে এই যুদ্ধে জয়লাভ করার জন্যে তাই জনসাধারণের স্বার্থ ছিল ষোলো আনাই।

কিন্তু জনসাধারণের স্বার্থ ষোলো আনা হলেও ব্রিটিশ বা ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা মোটেই চায় নি যে জনসাধারণ, বিশেষ করে পরাধীন দেশের জনসাধারণ, এ যুদ্ধ চালাবার ভার নেয়। তাহলে তাদের হাতে যে তুলে দিতে হয় হাতিয়ার! যুদ্ধে জয়লাভের ঐ একটিমাত্র উপায় হলেও সাম্রাজ্যবাদ প্রাণ থাকতে অমন কাজ করতে পারে না। কিন্তু অবস্থা ক্রমেই এমন ঘোরাল হয়ে দাঁড়ায় যে সাম্রাজ্যবাদীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াক্কা না রেখে ঘটনাচক্রে হাতিয়ার এসে পড়ল অনেক পরাধীন দেশেরও জনসাধারণের হাতে—তাদেরই নিতে হলো যুদ্ধ চালাবার দায়িত্ব। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপান যুদ্ধে যোগ দেবার পর ভিয়েতনাম, মালয়, বর্মা, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন থেকে ফরাসী, ব্রিটিশ, ওলন্দাজ ও মার্কিন প্রভুরা যখন বিনাযুদ্ধে পালিয়ে গেল তখন ঠিক এ ব্যাপারই ঘটল ঐ সব দেশে। সেখানকার দেশপ্রেমিকেরা তখন হাতিয়ার নিয়ে বনেজঙ্গলে গেরিলা লড়াই শুরু করেন দুর্ধর্ষ জাপানী-বাহিনীর বিরুদ্ধে। আর এর প্রত্যেকটি দেশেই ঐ প্রতিরোধ লড়াই-এর নেতা হয়ে দাঁড়ালেন সেখানকার কমিউনিস্টরাই।

আসল লড়াই কিন্তু চললো সোভিয়েতের মাটিতে। সেখানে এক-দিকে সাধারণ মানুষের আশ্চর্য দেশপ্রেমিক প্রতিরোধ আর অন্যদিকে নেতৃত্বের অপূর্ব রণকৌশল ক্রমে যুদ্ধের মোড় ফেরাতে লাগল। চূড়ান্তভাবে মোড় ফিরল ১৯৪৪ সালে বিশ্ববিখ্যাত স্তালিনগ্রাদের

যুদ্ধে। ঐ যুদ্ধে হিটলার বাহিনীর প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ সৈন্য সেনাপতি সমেত হতাহত বা বন্দী হয় লাল ফৌজের হাতে।

এরপর থেকে অতি দ্রুত হিটলারের পরাজয় ঘটতে থাকে। ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা ঘটনাচক্রে সোভিয়েতের মিত্র হলেও তারা তো ছিল সাম্রাজ্যবাদীই। তাই যুদ্ধে জয় চাইলেও তারা এটাও চাইছিল যে প্রচুর রক্তক্ষয় করে সোভিয়েত যেন বেশ ঘায়েল হয়ে পড়ে। তাহলে যুদ্ধের পরে সারা পৃথিবীর ওপরে তাদের মাতব্বরী কেউই ঠেকাতে পারবে না। এইজন্যেই সোভিয়েত যখন ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলে তার ওপরে হিটলার বাহিনীর চাপ কমাবার প্রস্তাব করল তখন চার্চিলের মতো সাম্রাজ্যবাদীরা গড়িমসি করতে থাকে মাসের পর মাস। কিন্তু এই যুদ্ধে নিজেদের স্বার্থ জড়িত রয়েছে বুঝে সব দেশের মানুষ, এমনকি ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকার মানুষও ক্রমাগত দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার জন্যে চাপ দেয়। ফলে, ১৯৪৪ সালের জুন মাসে শেষ পর্যন্ত খুলতে হয় দ্বিতীয় ফ্রন্ট।

এরপর যুদ্ধের ফল কি দাঁড়াবে সে সম্পর্কে আর অনিশ্চয়তা রইল না। ১৯৪৫ সালের অগাস্ট মাসে জাপান আত্মসমর্পণ করে। এর মাত্র কয়েকদিন আগে—জাপানীরা হার মানতে যাচ্ছে এ কথা পরিষ্কার জেনেও—মার্কিনরা নৃশংসভাবে জাপানের দুটি শহর—হিরোশিমা ও নাগাসাকির ওপরে পারমাণবিক বোমা ফেলে। ফলে অসহ্য যন্ত্রণা পেয়ে মারা যায় শহরের লক্ষাধিক বাসিন্দা, আহত হয় আরো বেশি মানুষ—নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ঐ দুটি শহর।

এই পারমাণবিক বোমা জাপানীদের ওপরে পড়লেও তারা যাতে তাড়াতাড়ি আত্মসমর্পণ করে সেই উদ্দেশ্যে তা ফেলা হয় নি। কারণ এর আগেই লালফৌজ জাপানে বিখ্যাত কোয়ানটুং সেনাবাহিনীর শিরদাঁড়া ভেঙে দিয়ে নিশ্চিত করেছিল কয়েকদিনের মধ্যেই জাপানের আত্মসমর্পণ। এর আসল লক্ষ্য ছিল অন্য সমস্ত দেশকে, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভয় দেখানো—সাবধান, দেখছ তো আমার হাতে কী অস্ত্র রয়েছে। অর্থাৎ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ

শেষ না হতেই এইভাবে মার্কিনেরা শুরু করল সোভিয়েতের বিরুদ্ধে 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ'—তৃতীয় মহাযুদ্ধের ভূমিকা হিসেবে।

নভেম্বর মাসে জার্মানিও আত্মসমর্পণ করে। তৃতীয় ফ্যাশিস্ট শক্তি ইটালি এর অনেক আগেই পরাস্ত হয়েছিল। মুসোলিনি শুধু যে গদি হারাল তাই নয়, তাকে প্রাণও দিতে হলো ক্রুদ্ধ ইটালিয়ান জনতার হাতে। শেষ হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

নতুনের আবির্ভাব

যুদ্ধের ভয়ঙ্কর বছরগুলিতে সব দেশের মানুষেরই যে ভীষণ অভিজ্ঞতা ঘটে তার ফলে তাঁদের অনেক পুরনো চিন্তাভাবনা, অনেক বিশ্বাস আর সংশয় নির্মূল হয়ে যায়। চোখের সামনে তারা দেখল কী করে যুদ্ধ বাধল, কে বাধাল, কারা লড়াইয়ে প্রাণ দিল আর কারাই বা মানুষের প্রাণের মূল্যে দুহাতে লুটল বিপুল মুনাফা। তাই এত সবের পরে তারা আবার সেই পুরনো দিনের জগতে ফিরতে চাইছিল না— আর ভেবেছিল এবার গড়া হবে নতুন সুন্দর পৃথিবী—এমন পৃথিবী যেখানে সমাজকে কয়েক বছর অন্তর অন্তর জোগাতে হয় না অজস্র পরিমাণ কামানের খোরাক।

তাই পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে সেদিন যে নতুন ধরনের সমাজের বনেদ গাঁথা হলো তা একটা আচমকা ঘটনা নয়। পুরনো ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যাদের লাভ ষোলো আনা এমন সব বড় লোক ও তাদের সাম্রাজ্যবাদী সরকার—বিশেষ করে মার্কিন মুল্লুকের ধনকুবেরদের সরকার যদি সেদিন বাদ না সাধত তবে সারা ইউরোপেই হয়তো সেদিন ঐ ধরনের সমাজের পত্তন শুরু হতো। এমন কি ফ্রান্স ও ইটালিতেও বিরাট শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যখন দেশের সমস্ত দেশপ্রেমিক দল একজোট হয়ে সরকার বানায় তখন তার সম্ভাবনা খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পূর্ব ইউরোপের সঙ্গে ঐ দুই দেশের তফাত ছিল এই যে, সেখানে দেশের মানুষ নিজের ভাগ্য নিজেই স্থির করতে পারে এমন অবস্থা ছিল না। কারণ লাল

ফৌজের বদলে সেখানে হাজির ছিল ইংরেজ ও মার্কিনদের সাম্রাজ্যবাদী বাহিনী। শেষ পর্যন্ত তাই ফ্রান্স ও ইটালিতে নতুন সমাজ গড়া সম্ভব হলো না।

যাই হোক পূর্ব জার্মানি, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, বুলগারিয়া, হাঙ্গেরি, আলবানিয়া ও যুগোশ্লাভিয়াতে সেদিন সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপ পেল জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্যে। এ কিন্তু আর ধনিকদের গণতন্ত্রী-মার্কা রাষ্ট্র নয়—যেখানে নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য ধনিকরা টাকা ঢেলে, নানা কারসাজি করে রাষ্ট্রকে পুরোপুরি আপন মুঠোয় রাখে। এর নাম 'জনগণতন্ত্র', কারণ দেশের সাধারণ মানুষ এখানে নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্যে 'জনসাধারণের কমিটি' মারফত দেশশাসনের ভার আপন হাতেই তুলে নেয়, আর ঐ ভাবেই পাকা করে তাদের খাওয়া-পরা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতির সঠিক ব্যবস্থা। কাজেই সেখানে যেসব দল বা মানুষ জনসাধারণের এই সব দাবিকে সবার ওপরে ঠাঁই দিতে রাজী তারাই স্থান পেল দেশশাসনের ব্যাপারে। তবে তার মধ্যেও যে মজুরদের পার্টি প্রধান শক্তি হিসেবে দেখা দেবে এ তো খুবই স্বাভাবিক। কারণ মজুরেরাই তো এ যুগের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী।

নতুন জনগণতান্ত্রিক সরকার প্রথমেই বড় বড় বনেদী জমিদারদের জমি কৃষকদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়। তা ছাড়া যুদ্ধের সময়ে যে সব ধনিকেরা হিটলারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল তাদের সম্পত্তিও শুরুতেই বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই বিপ্লবের ফলে বেশ কিছুটা বদলে যায় দেশগুলির চেহারা। স্বচ্ছল, শান্তিময়, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে উজ্জ্বল জীবন গড়ে তোলার সুবিধা পায় মানুষ। অনেক দিনের পিছিয়ে-পড়া অবস্থা দূর করে দেশগুলি এগোতে থাকে সমাজতন্ত্রের দিকে।

এ সবের ফলে পুরনো আমলের বনেদী যে সব বড় লোকের স্বার্থে ঘা পড়ল তারা কিন্তু চুপ করে রইল না। তারা উঠে পড়ে লাগল নতুন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। তাই এ-সব দেশেও সমাজের

রূপান্তর ঘটানো ব্যাপারটা মোটেই সহজ হলো না। শুধু তাই নয়, অন্য দেশের সাম্রাজ্যবাদীরা, বিশেষ করে মার্কিন শাসকেরা, তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এমন একটা ব্যবস্থার পত্তন কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারল না। তারা অবিরাম কুৎসা প্রচার, গুপ্তচর বৃত্তি, এমন কি দেশদ্রোহীদের রাশি রাশি টাকা, অস্ত্রশস্ত্র পর্যন্ত জোগান দিয়ে জনগণতান্ত্রিক সরকারগুলিকে খতম করবার অনবরত চেষ্টা চালালো। কিন্তু জনগণতান্ত্রিক দেশগুলির সরকার ও সাধারণ মানুষের সতর্কতার দরুন শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যায়—শাস্তি পায় দেশদ্রোহীরা। তবু সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের অপচেষ্টা আজো চলছে শুধু নয় বরং বেড়েই চলেছে বিরামবিহীনভাবে।

একটা কথা মনে রাখা দরকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে হিটলারপদানত প্রায় সব দেশেই প্রতিরোধ-আন্দোলনের প্রধান শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল শ্রমিকশ্রেণী ও তাদের কমিউনিস্ট পার্টি; আর এই জন্য তাকে আত্মদানও করতে হয়েছে সব থেকে বেশি। ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির তো নামকরণই হয়েছিল 'শহীদের পার্টি'। এত আত্মদান সত্ত্বেও পার্টিগুলি ঐ সময়ে দ্রুত বেড়ে ওঠে, নানা অভিজ্ঞতায় সুসমৃদ্ধ মজবুত পার্টি হিসেবে। অন্য দিকে যুদ্ধের অবস্থায় 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক'-এর মতো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব ছিল না একটি কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন দেশের দ্রুত পরিবর্তনশীল অবস্থার হদিশ রাখা এবং তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিত্য-নতুন কৌশল বদলানোর নির্দেশ প্রদান করা। তাছাড়া 'তৃতীত আন্তর্জাতিক'-এর অস্তিত্ব সোভিয়েতের মিত্র-শিবিরের প্রতিক্রিয়াশীল মহলকে অনর্থক সুযোগ করে দিচ্ছিল এই কুৎসা রটাতে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন নাকি তার মারফৎ তলেতলে বিভিন্ন দেশে চক্রান্ত করছে। এই সব বিবেচনা করেই ১৯৪৩ সালে তুলে দেওয়া হলো 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক' প্রতিষ্ঠানটি। যুদ্ধের পর ১৯৪৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ইউরোপের জনগণতান্ত্রিক দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টি আর ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার সব থেকে বড় ও অভিজ্ঞ, ফ্রান্স ও ইটালির দুই কমিউনিস্ট পার্টি

নিয়ে একটি কমিউনিস্ট ইনফর্মেশন ব্যুরো (Cominform) গড়া হয়েছিল, ঐ-সব পার্টির মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে। ঐ সংস্থাটিকেও কিছুদিন পরে তুলে দেওয়া হয় নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে।

রাজনৈতিক আন্দোলন বাদেও দুনিয়ার মজুরশ্রেণী যাতে দৈনন্দিন দাবি দাওয়ার লড়াই ভালো করে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে চালাতে পারে তার জন্য ১৯৪৫ সালেই প্রধানত কমিউনিস্টদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ' (World Federation of Trade Unions)। মজুরশ্রেণীর শত্রুরা গোড়া থেকেই নানাভাবে এর ভিতরে ফাটল ধরাবার চেষ্টা করে—কয়েক বছর পরে একটা অংশ ঐ সংঘ থেকে বেরিয়ে গিয়ে পৃথক এক সংগঠনও গড়ে তোলে। তা সত্ত্বেও বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ এখনো পৃথিবীর বৃহত্তম ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা।

যুদ্ধোত্তর পর্বের আর এক বিরাট ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হলো 'সম্মিলিত জাতি সংঘ' বা United Nations Organisation। ১৯৪৫ সালেই সানফ্রানসিস্কো শহরে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমেত পঞ্চাশটি রাষ্ট্র একত্র হয়ে প্রতিষ্ঠা করে এই সংঘ এবং রচনা করে তার বিখ্যাত সনদ। সেই সনদে ঘোষণা করা হয় সকল জাতির সমান অধিকার, প্রত্যেক জাতির নিজের ভাগ্য নিজের হাতে রচনা করার অধিকার এবং জাতিতে জাতিতে মৈত্রীবন্ধন ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার সুদৃঢ় সংকল্প।

গোড়ায় গোড়ায় জাতি সংঘে মার্কিনদের আধিপত্য খুবই প্রকট ছিল। এমন কি কোরিয়া যুদ্ধের বেলায় ঐ সংঘ প্রায় মার্কিন সরকারের ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করে। তা ছাড়া চীন, কিউবা, ভিয়েতনাম ও এঙ্গোলার জাতি সংঘে প্রবেশকে মার্কিন সরকার যতদিন সম্ভব ঠেকিয়ে রেখেছিল—আজো তারা ঠেকিয়ে রেখেছে নতুন কাম্পুচিয়াকে। আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েই আমেরিকা জাপানে পারমাণবিক বোমা ফেলে এবং তারপরে চার্চিল সাহেব মার্কিন সফরকালে ফাল্টন শহরে তাঁর কুখ্যাত বক্তৃতায় ঘোষণা করেন

সোভিয়েতের বিরুদ্ধে ঠাণ্ডা যুদ্ধ। সেই দুষ্ট আবহাওয়াতেই জাতি-সংঘের ঐ হাল হয়েছিল, সোভিয়েত ও পূর্ব ইয়োরোপের সমাজ-তান্ত্রিক দেশগুলির প্রতিনিধিদের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও। কিন্তু কয়েক বছর পর থেকেই দ্রুত বদলাতে থাকে ঐ অবস্থা—তা এতখানি আজ বদলেছে যে মার্কিন সরকারের তরফ থেকে এখন মাঝে মাঝে হুমকি শোনা যাচ্ছে—এমন চললে আমরা জাতি সংঘ বর্জন করব।

পরাধীনের শৃংখল মোচন—তৃতীয় দুনিয়ার উদ্ভব

জাতিসংঘের এই মতিগতি পরিবর্তন অহেতুক নয়। এর প্রধান কারণ যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে একের পর এক পরাধীন দেশের শৃঙ্খলমোচন এবং স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ। এর ফলেই সাম্রাজ্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া বাদেও উদ্ভব হয়েছে সদ্য-স্বাধীন জাতিগুলিকে নিয়ে এক বিশাল তৃতীয় দুনিয়ার। আর তৃতীয় দুনিয়ার উদ্ভবের ফলে যেমন সারা দুনিয়ায়, তেমনি জাতিসংঘের মধ্যেও বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে ভারসাম্যের ক্ষেত্রে। এ ঘটনাটি একটু বিশদভাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে।

প্রথমে মুক্ত হলো ভারত উপমহাদেশ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে শুরু হয় ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে একের পর এক গণঅভ্যুত্থান। যুদ্ধের সময়ে সুভাষচন্দ্রের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও ব্রিটিশদের তরফ থেকে তাঁর আই. এন. এ বাহিনীর বন্দী সিপাহী ও অফিসারদের বিচার অনুষ্ঠানের ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে সারা দেশ বিপুল বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারই সঙ্গে যুক্ত হয় ব্যাপক শ্রমিক ও ছাত্র ধর্মঘট; কাশ্মীর, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন, হায়দ্রাবাদের মতো দেশীয় রাজ্যে সশস্ত্র আন্দোলন; তেভাগা, হাজং, ওরলির মতো কৃষক ও আদিবাসী-অভ্যুত্থান এবং সর্বোপরি ভারতীয় নৌবাহিনীর বিদ্রোহ।

এই সব অভ্যুত্থান একদিকে যেমন সন্ত্রস্ত করেছিল ইংরেজ শাসকদের, তেমনি আবার ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ধনিক-জমিদার ঘেঁষা নেতৃত্বকেও করেছিল আতঙ্কিত। অথচ কমিউনিস্ট

বা বামপন্থী শক্তির আপেক্ষিক দুর্বলতার দরুন ঐ নেতৃত্বের হাতেই রয়ে গেল জাতীয় আন্দোলন পরিচালনার প্রধান ভার। তাই বিক্ষোভ কমিউনিস্টদের পরিচালনায় বিপ্লবের পথে না গিয়ে জাতীয় নেতৃত্বের পরিচালনায় তা পর্যবসিত হলো সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আপস-রফায়। আর তারই ফলে ব্রিটিশ এদেরই কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করল বটে, তবে দেশকে দ্বিখণ্ডিত করার পূর্ণ মূল্যও আদায় করে নিল। ভারত ও পাকিস্তান—এই দুই নবোদ্ভূত ও পরস্পর-বিরোধী স্বাধীন দেশ তাই বহুদিন পর্যন্ত অল্পবিস্তর সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মুখাপেক্ষী হয়ে রইল।

এরপরে বিরাট ওলটপালট দেখা গেল পৃথিবীর সব থেকে বেশি মানুষের দেশ মহাচীনে। ব্যাপারটা কিন্তু আচমকা ঘটে নি। ১৯২৭ সালে চিয়াং কাই-শেকের বিশ্বাসঘাতকতার পর দেশের কিছুটা জায়গায় কুওমিনটাং-এর অত্যাচারী শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও আসলে সারা দেশ প্রায় আগের মতোই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল—বহু যুদ্ধবাজ সেনাপতির দ্বারা তাদের নিজ নিজ এলাকায়। যে শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ ও গণতান্ত্রিক চীনের জন্য সান ইয়াৎ-সেন ১৯১১ সাল থেকে লড়াই শুরু করেছিলেন তা আকাশকুসুমই রয়ে যায়। তাই আবার শুরু হয় বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এবং দেশী ডাকাত-জমিদারদের অবাধ জুলুম ও দাপট।

এর ফলে স্পষ্টই বোঝা গেল চীনকে প্রকৃত স্বাধীন, ঐক্যবদ্ধ ও গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত করার ক্ষমতা ধনিক বা জমিদারদের নেই, তার ভার নিতে হবে চীনের শ্রমিক ও তাদের পার্টিকেই। গোড়ার দিকে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এই গুরু দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত ছিল না। তবে চিয়াং কাই-শেকের নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে বছরের পর বছর ধরে মরিয়া লড়াই চালিয়ে অনেক ক্ষয়ক্ষতির পর মাও সে-তুং-এর নেতৃত্বে পার্টি সঠিক পথের সন্ধান পায় এবং ইতিহাসখ্যাত এক দীর্ঘ যাত্রার (Long March) পরই পার্টি দেশের উত্তর পশ্চিমে একটি শক্ত ঘাঁটি গড়ে তুলে এক নতুন সরকার স্থাপন করে।

মাও সে-তুং দেশবাসীকে বোঝালেন যে, চিয়াং-এর গৃহযুদ্ধের নীতিই সারা দেশকে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে তুলে দেবার উপক্রম করেছে। তিনি তাই তাঁদের কাছে স্পষ্ট ভাষায় আবেদন জানালেন—কোন চীনা আর চীনা ভাইয়ের বিরুদ্ধে লড়বেন না—সব চীনা এক হয়ে রুখবে জাপানী দস্যুদের হামলা। কমিউনিস্ট পার্টির এই আবেদন আর জাপানী আক্রমণের বাস্তবতা—এই দুইয়ের ফলে চীনা জনসাধারণের চোখ খুলতে থাকে। অবস্থা শেষ পর্যন্ত এমন দাঁড়ায় যে চিয়াং কাই-শেক্‌কেও মেনে নিতে হয় গৃহযুদ্ধ বন্ধ করে জাপানকে রুখবার দাবি।

কিন্তু সে শুধু ওপরে ওপরে। তলে তলে চিয়াং সর্ববিধভাবে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধতা চালাতেই থাকে; শুধু এখানে ওখানে কমিউনিস্টদের হত্যা বা তাঁদের প্রতি নির্মম অত্যাচারই নয়, পাঁচ পাঁচটি পূর্ণাঙ্গ সামরিক অভিযান চালানো হয় উত্তর-পশ্চিম চীনের কমিউনিস্ট এলাকার বিরুদ্ধে। কিন্তু জাপানী আক্রমণ থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্য সমগ্র ঐক্যের সঠিক রাজনীতি এবং নিজেদের সামরিক শক্তি ও কৌশলের সাহায্যে কমিউনিস্টরা প্রতিবারই সার্থকভাবে প্রতিহত করলেন চিয়াং-এর অভিযান।

যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই চিয়াং কাই-শেক সমস্ত রাখঢাক বিসর্জন দিয়ে আবার খোলাখুলি অভিযান শুরু করে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে। এবারে তার মুরুব্বির বরাতও ছিল ভালোই। ইউরোপে বড় রকম ঘা খেয়ে আমেরিকা উঠে পড়ে লাগল এই ষাট ক্রোটি মানুষের বাজার দখল করার জন্যে।

মার্কিন ডলার, মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র, মার্কিন উপদেষ্টার জোরেও কিন্তু চিয়াং কাই-শেক সেদিন মোটেই সুবিধা করতে পারল না। কারণ অস্ত্রশস্ত্র তো আর লড়াই করে না—লড়ে তার পিছনকার মানুষ। সে মানুষ যদি চিয়াং কাই-শেক বা কুওমিনটাং-এর নেতাদের মতো অত্যাচারী ও অপদার্থ হয়, তার যুদ্ধ যদি হয় অন্যায় যুদ্ধ তবে কিছুতেই তারা সমর্থন পেতে পারে না দেশের মানুষের। আর অন্যদিকে

কমিউনিস্ট নেতৃত্বে পরিচালিত গণমুক্তি ফৌজ যখন দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের হয়ে হাতিয়ার ধরল তখন তার হাতিয়ারের শক্তির থেকেও জোরালো হয়ে উঠল ঐ কোটি কোটি মানুষের সমর্থন।

তাই কোটি কোটি ডলার বা কামান-বন্দুক-এরোপ্লেনেও চিয়াং কাই-শেকের শেষরক্ষা হলো না। ১৯৪৯ সালে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে তাকে সাঙ্গোপাঙ্গসমেত পালাতে হলো ফরমোজায়।

আর ঐ বছর অক্টোবর মাসে মাও সে-তুং ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে প্রায় গোটা চীন ঐক্যবদ্ধ হলো চীনের জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মধ্যে। অবশেষে এতদিনে সার্থক হলো অসংখ্য চীনা শহীদের আত্মদান।

কিন্তু শুধু ভারতবর্ষ বা চীনের মতো বিশাল ও কোটি কোটি মানুষের দেশই নয়, ছোট বড় সব পরাধীন দেশই এরপর থেকে একের পর এক স্বাধীনতার পথে পা বাড়াল। তার মধ্যে বিশেষ করেই বলা যেতে পারে একদা ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ইন্দোচীন নামে পরিচিত দেশটির কথা। এখন সেই ইন্দোচীনের ভৌগোলিক সংজ্ঞার বদল ঘটেছে, সেখানে আবির্ভূত হয়েছে তিনটি স্বাধীন দেশ— ভিয়েতনাম, লাওস ও কাম্পুচিয়া। এরা স্বাধীন হয়েছে তাদের পুরনো মনিব ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে শুধু নির্ভীক সংগ্রাম চালিয়েই নয়, পৃথিবীর সব থেকে পরাক্রমশালী সাম্রাজ্যবাদী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বছরের পর বছর লড়াই চালিয়েও। কোটি কোটি ডলারের সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র এবং লক্ষ লক্ষ সৈন্য নামিয়েও আমেরিকা পদানত করতে পারে নি এই দেশগুলিকে। এর মধ্যে ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট পার্টির অসামান্য নেতা ডঃ হো চি-মিন তাঁর জীবদ্দশাতেই পরিণত হয়েছিলেন ইতিকথার এক প্রবাদ-পুরুষে। তাঁর নেতৃত্বে ঐ তিন দেশের কমিউনিস্ট ও জাতীয়তাবাদীরা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মার্কিন বাহিনীকে সম্পূর্ণ পর্যদস্ত ক'রে স্বাধীন করেছে তাদের দেশকে। বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জাপানী ফ্যাশিস্ট বাহিনী এবং তারপরে ফরাসী

ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী বাহিনীকে একে একে তাদের দেশ থেকে তারা বিতাড়িত করেছে।

উত্তর কোরিয়াতেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কিম ইল-সেনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এক জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। দক্ষিণ কোরিয়া কিন্তু এখনো রয়েছে মার্কিনী কবলে। ১৯৫০ সালে মার্কিন সৈন্যবাহিনী উত্তর কোরিয়া আক্রমণ করে কিন্তু চীন থেকে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী উত্তর কোরিয়ার সাহায্যে এগিয়ে আসে। ফলে শেষ পর্যন্ত মার্কিন-বাহিনীকে পিছু হটতে হয় উত্তর কোরিয়া থেকে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান একসময়ে এ-যুদ্ধে পারমাণবিক বোমা ফেলার হুমকি দেন—তাঁকেও শেষ পর্যন্ত বিশ্বজনমতের কাছে মাথা নোয়াতে হয়।

ব্রিটিশ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও পর্তুগীজ শাসকেরা সহজে তাদের এতদিনকার জমিদারী ছাড়তে চায় নি, এ-কথা সহজেই বোঝা যায়। এমন কি যুদ্ধের সময়ে জাপানীদের আক্রমণে তাদের যে-সব উপনিবেশ হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল তারা প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল আবার সেগুলো অধিকার করতে। শুধু ভারতবর্ষে বা ব্রহ্মদেশে ইংরেজ বা তথাকথিত ইন্দোচীনে ফরাসীরা নয়, ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজেরা আবার ক্ষমতা দখলের চেষ্টায় যুদ্ধ বাধায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারে নি অবস্থার সামাল দিতে।

তেমনি অনেক বছর লড়াই চালিয়েও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের শেষ পর্যন্ত ছাড়তে হয় আলজিরিয়া। মরোক্কো, টিউনিসিয়া, ফরাসী একোয়েটারিয়াল আফ্রিকা, মাদাগাস্কার, সেনিগাল প্রভৃতি উপনিবেশ যেমন ফরাসীদের হাতছাড়া হয় তেমনি উগাণ্ডা, কেনিয়া, ঘানা, টানজানিয়া, সুডান ব্রিটিশদের এবং কঙ্গো ও এঙ্গোলা বেলজিয়ান সাম্রাজ্যবাদীদেরও হাতছাড়া হয়ে যায়। এ-ছাড়াও আরো অনেক ছোট ছোট রাজ্য ক্রমে ক্রমে স্বাধীনতা ঘোষণা করে আফ্রিকায়। শুধু তাই নয়, নামমাত্র স্বাধীন ইথিওপিয়া এবং এঙ্গোলা স্বাধীন হয়েই সমাজতন্ত্রের পথে পা বাড়ায়।

পশ্চিম এশিয়ার যে দেশগুলি ফরাসী ও ইংরেজের তাঁবে ছিল

সেগুলিও এবার সত্যিই স্বাধীন হলো, স্বাধীন হলো ইরাণ আর দক্ষিণ ইয়েমেন। আফগানিস্তানও অগ্রসর হলো সমাজতন্ত্রের পথে।

উত্তর আমেরিকায় খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে মাত্র ৯০ মাইল দূরে অবস্থিত ছোট্ট কিউবা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ভ্রূকুটি, অবিরাম চক্রান্ত, এমন কি সামরিক হামলা তুচ্ছ করেই বীর-নেতা ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চললো সমাজতন্ত্রের পথে। ঠিক ঐভাবেই মার্কিন হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও প্রথমে নিকারাগুয়া আর এখন এল সালভাদের বীরদর্পে এগিয়ে চলেছে প্রকৃত স্বাধীনতা এবং সমাজতন্ত্রের পথে। ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতেও সমাজতন্ত্র ক্রমশ প্রসারলাভ করছে সমাজের সমস্ত স্তরেই।

পরিস্থিতির জটিলতা

এ-কথা কিন্তু মনে রাখা দরকার যে ইতিহাস কখনো সরল রেখা ধরে এগোয় না, আর বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন সময়ে তার গতিবেগও অসমান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে প্রচণ্ড দ্রুতগতিতে তাদের বিপুল বৈষয়িক ক্ষতি (যুদ্ধে সোভিয়েত দেশে প্রায় দু'কোটি মানুষ নিহত এবং দু'হাজার শহর ধূলিসাৎ হয়েছিল) পূরণ করে দেখতে দেখতে সব দিক থেকে এগোতে লাগল তা সত্যই বিস্ময়কর। সারা দুনিয়ায় এর কোনো তুলনা নেই। এটাও ঠিক যে সমাজতন্ত্রের শক্তি সর্বত্রই প্রসারলাভ করছে—এশিয়া, আফ্রিকা, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে। তবু অগ্রগতি সব সময়ে একটানা ঘটে নি। গোয়াতেমালা, ইন্দোনেশিয়া, চিলিতে সাময়িকভাবে প্রতিহত হয়েছে সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি এবং আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নির্মম প্রতিক্রিয়াশীলদের। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে আরো মরিয়া ও মারমুখো হয়েছে তার প্রমাণ সম্প্রতি সেখানকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যুদ্ধবাদী রেগানের জয়লাভ। তেমনি পশ্চিম জার্মানি, জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকায় এখনো অক্ষুন্ন রয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি। মার্কিনদের

যুদ্ধ ঘাঁটি ছড়ানো রয়েছে পৃথিবীর দেশে দেশে। ভারত মহাসাগরে ও ডিয়েগো গর্সিয়ার নৌঘাঁটি এবং তার নৌ আর সাবমেরিন বাহিনীর কথাও সকলেরই জানা। তাছাড়া যে-সব দেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদী ফৌজ সরিয়ে নেওয়া হয়েছে সেখানে তাদের নতুন ধরনের শৃঙ্খলে বাঁধা হচ্ছে ঋণ ও সাহায্যদানের অজুহাতে। এ ব্যাপারে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক বা ইণ্টারন্যাশনাল মনেটারি ফাণ্ডের মতো মার্কিন প্রভাবাধীন প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বিশেষ তৎপর হয়েছে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি, যাদের অধিকাংশের মধ্যেই প্রাধান্য রয়েছে মার্কিন পুঁজির। পুরনো ধরনের ঔপনিবেশিক নীতির স্থানে এ সবের মারফৎ নয়া ঔপনিবেশিক জালে জড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে সদ্যস্বাধীন ও উন্নয়নশীল দেশগুলিকে।

বিপদ আর এক দিক থেকেও দেখা দিয়েছে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মস্ত বড় শক্তি চীন প্রায় ২৫ বছর হতে চললো মারাত্মক রকম ভ্রান্ত ও বিপজ্জনক পথে চলেছে। প্রতিবেশী দেশগুলিতে যেন তেন প্রকারেণ আধিপত্য বিস্তারের জন্য তার জঙ্গী অপচেষ্টা ভারতবর্ষে, ভিয়েতনাম ও কাম্পুচিয়াতে বারংবার দেখা গেছে—এমন কি সে সীমান্ত সংঘর্ষ লাগাবার চেষ্টা করেছে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গেও। মাও সে-তুং-এর সময়েই এ-সব দুর্লক্ষণ প্রকট হয়েছিল আর তাঁর মৃত্যুর পরে তো সেখানে শাসকদলের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম চরমে উঠেছে। বর্তমানে চীনের সব থেকে শক্তিশালী নেতা ডেং জিয়াও-পিং আমেরিকা গিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে একযোগে ঘোষণা করেছেন যে অতঃপর সোভিয়েত ইউনিয়নকে জব্দ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, পশ্চিম ইউরোপ ও জাপান একত্রে সংগ্রাম করবে। চীনের জাতিদম্ভ এবং সম্প্রসারণবাদ একদিকে বিভীষিকার মতো উপস্থিত হয়েছে সারা পৃথিবীতে, অন্য দিকে সে চিলি, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং পাকিস্তানের মতো সব থেকে প্রতিক্রিয়াশীল সরকারগুলিকে অস্ত্রশস্ত্র, অর্থ—সবরকমে সাহায্য করছে অকাতরে, ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সংকটগ্রস্ত রাজ্যগুলিতে আরো জল ঘোলা করছে সেখানকার অন্তর্ঘাতী শক্তিগুলিকে অস্ত্র ও

সামরিক ট্রেনিং-এ সুসজ্জিত করে। চীনের এই পক্ষ পরিবর্তন মস্ত এক বিপদ সৃষ্টি করেছে সারা পৃথিবীতে। তবে সেখানেও আন্তর্জাতিকতাবাদী কমিউনিস্টরা প্রাণপণ চেষ্টা করছেন চীনকে আবার প্রকৃত সমাজতন্ত্রের পথে ফিরিয়ে আনার জন্যে।

যুদ্ধ, না শান্তি

দুনিয়ার সাম্প্রতিক হালচাল থেকে একটা কথা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। প্রথম মহাযুদ্ধ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্ভবের পর থেকে ধনতান্ত্রিক দুনিয়া যে একটানা সংকটের ঘূর্ণিপাকে পড়েছে, এর থেকে তার মুক্তি নেই—তবে হয়তো সাময়িকভাবে কিছুটা উপশম ঘটা সম্ভব এখানে সেখানে। অন্যদিকে সোভিয়েত ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক শক্তির অগ্রগতি, ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেও শ্রমজীবী, বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণ মানুষের তরফে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও তার মূল্যবোধ সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধা এবং সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সহয়তায় তৃতীয় দুনিয়াভুক্ত দেশগুলির অগ্রগতির প্রচেষ্টা—বর্তমান যুগের এই তিন বিপ্লবী প্রক্রিয়া অব্যাহত গতিতে চলছে, যদিও সেখানেও বিপরীতমুখী ঘটনা দেখা যাচ্ছে, যেমন চীনের ক্ষেত্রে। এই দুই পক্ষের ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়েই উদঘাটিত হবে ভবিষ্যত ইতিহাসের যবনিকা।

এই সংকট থেকে উদ্ধারের জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা, বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা বাধাতে চায় যুদ্ধ, অন্তত সৃষ্টি করতে চায় যুদ্ধের প্রবল উত্তেজনা। কারণ তাদের বাজার আগের চাইতে ইতিমধ্যে অনেক ছোট হয়ে গেছে একশ কোটিরও বেশী মানুষ বসবাস করছে সমাজতন্ত্রের দেশে আর তৃতীয় দুনিয়ার মানুষও ঝুঁকছেন সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে লেনদেনের দিকে, সাম্রাজ্যবাদী দেশের চাইতে অনেক বেশি সুবিধাজনক শর্তে। এই অবস্থায় পড়ে পারমাণবিক যুদ্ধের অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি না নিয়েও তারা ক্রমাগত স্থানীয় যুদ্ধ বাধাচ্ছে বা যুদ্ধের উত্তেজনা বাড়িয়ে চলেছে। কারণ যুদ্ধ বাধলে বা যুদ্ধের আয়োজন করতে হলে দরকার কোটি কোটি টাকার

মালপত্র। আর তার যোগান দিয়ে তখন সাম্রাজ্যবাদীরা মুনাফা কামাতে পারবে ছ'হাতে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন বা অন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে ধনিকদের বিষ দাঁত ভেঙেছে। সেখানকার মানুষদের তাই আর মোটা মুনাফার সন্ধানে হন্যে হয়ে ছুটতে হয় না, বরঞ্চ তারা আজ নির্ঝঞ্ঝাটে সানন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্য জীবন-যাপনেই আগ্রহী। কাজেই ঘৃণ্য স্বার্থসিদ্ধির জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের মতো তাদের পিছনে কোনো তাগিদ নেই যুদ্ধ বাধানোর বা জঙ্গীপনার।

কিন্তু যুদ্ধের অর্থ কি তা পৃথিবীর সাধারণ মানুষ এখন ভালো করেই বোঝেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রলয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা অল্প বিস্তর অনেক দেশেরই আছে। তারপর কোরিয়া ভিয়েতনামের যুদ্ধেও মারা পড়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ, সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে হাজার হাজার গ্রাম ও শহর। তার উপরে সকলেই জানেন হিরোশিমা, নাগাসাকির কথা। কাজেই যুদ্ধ বাধলেই মানুষের সামনে বিভীষিকার মতো দেখা দেয় পারমাণবিক সামগ্রিক বিনষ্টির আশঙ্কা।

সারা পৃথিবীর মানুষের তাই আজ অন্তরের কামনা—সব রকম শোষণ ও অত্যাচার, জুলুম এবং জবরদস্তির অবসান। তাদের কামনা—প্রত্যেক জাতি ও মানুষের স্বাধীন, সানন্দ, স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর জীবনযাত্রা, আর এ-সবের জন্যই সবার ওপরে একান্তভাবে প্রয়োজন বিশ্বশান্তির প্রতিষ্ঠা। দুই শতাব্দীর বিপ্লবের নানা আঁকা-বাঁকা পথ পার হয়ে আজকের পৃথিবী সেই দিকেই ধাবমান।

———